ইউনিট ২: প্রাথমিক শিক্ষা
Primary Education

ভূমিকা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল হল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন শুরু করে। তাই গুণগত মানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা আজ যুগের দাবি যা তাদের পেশাগত জীবনে সহায়ক হয়। বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা (World Bank, 2000:8)। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সরকার ১৯৮১ সালে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করেন। ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৯২ সালে ৬৮টি থানাকে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের সকল থানাকে এই আইনের আওতাধীন আনা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে (Alam, 2000:43)। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের ন্যূনতম শিক্ষার চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে সরকার ২ জুন, ২০০৩ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করাসহ সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাার সুপারিশ করা হয় যা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়নের শুরু হয়ে গেছে। ২০১৩ সালে প্রায় ২৫২৪০ টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরত্ব দিয়ে ৫৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন-৩ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়াও সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার স্যাটেলাইট এবং কমিউনিটি স্কুল, আনন্দ স্কুল চালু, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন, অভিভাবক ও SMC মেম্বারদের অংশ গ্রহণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ইউনিটে আমদের আলোচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

পাঠ ২.১: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রান্তিক যোগ্যতা
পাঠ ২.২: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, ঝরেপড়া এবং সমাপ্তিকরণ
পাঠ ২.৩: প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়ন
পাঠ ২.৪: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা
পাঠ ২.৫: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ ২.৬: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থায়ন
পাঠ ২.৭: প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
পাঠ ২.৮: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ

পাঠ ২.১: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রান্তিক যোগ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো লিখতে পারবেন।

উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বিষয়টি আজ বিশ্বজনীন। যেহেতু উন্নয়নের প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা; আর সকল স্তরের শিক্ষার ভিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা; সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত। Quah (১৯৯৯) তার গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পান। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে Mingat (১৯৯৫) ব্যক্ত করেন যে, "যদি কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আরেকটি দেশের চেয়ে ৯০ শতাংশ বেশি থাকে, তাহলে ৩০ বছর পর অর্থতৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ৭৫ শতাংশ বেশি হবে"। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাক্ষরতা অর্জনের পূর্বে ও পরে সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন সাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতায় তীক্ষ্ণধী এবং পরিবেশের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। উপযুক্ত শিক্ষা শুধু মানুষের আয়ই বাড়ায় না ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তার কণ্ঠস্বরও উচ্চকিত করতে সাহায্য করে। নিরক্ষর আর সাক্ষর মানুষের মনের জোর, অংশগ্রহণের সুযোগ এবং অধিকার সচেতনতা ভিন্ন হতে বাধ্য (রহমান এবং রহমান, ২০০২:২২)।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ারা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাংক আটটি দেশকে HPAE (High performing Asian Economics) বলে আখ্যায়িত করেছে (আহমেদ, ২০০১:৪)। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির পেছনে শিক্ষার যে ব্যাপক অবদান রয়েছে সে বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে (দেখুন World Bank, 1993; Mingat, 1995; Mundle; 1995, Rao, 1995; Stevenson, 1998; Moris and Suiting, 1995; Quah, 1993)। এসব গবেষণার প্রায় প্রত্যেকটিতেই উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিগত শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে যেসব পরিবারের খানা প্রধানের শিক্ষা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের দারিদ্র্য কমেছে। এর উল্টো অবস্থা দেখা গেছে সেই সব পরিবারে যেখানে খানা প্রধানের শিক্ষাস্তর ৫ম শ্রেণির উর্ধ্বে (BBS, ২০০১)। আলম (২০০০), হোসেন (১৯৮৯) এবং আহমদ (১৯৯২)-এর গবেষণায়ও বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পাঠে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা কি, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রান্তিকযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সোপান। বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি, বয়সসীমা, সময়সীমা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে International Dictionary of Education-এ বলা হয়েছে–

Primary education as those of study during which no differentiation is introduced either in the form of optional subjects or in streaming of pupils towards different types of institutions or education.[2]

The world book encyclopedia-তে বলা হয়েছে-

Primary education or elementary education extends from the beginning of compulsory education, the children may then go to secondary education; usually at the age of 10, 12, or 14 or they may have school after completing the whole of their formal education in the same school. ... Today, primary education is treated in progressive countries as an extremely important stage in child's education. It should then be followed by secondary education, which should be available for all children.[3]

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচ বছরের শিক্ষাকে বোঝায়। ৬ থেকে ১১$^{+}$ বয়সের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এতে শিক্ষা বছর শুরু হয় জানুয়ারি মাসে এবং শেষ হয় ডিসেম্বর মাসে। বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই শিফ্‌টে চলে। ১ম শিফ্‌ট সকাল ০৯:৩০টা থেকে ১২টা এবং ২য় শিফ্‌ট দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা ১৫মিনিট পর্যন্ত চলে। ১ম শিফ্‌টে পড়ানো হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ২য় শিফ্‌টে পড়ানো হয় তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। উভয় শিফ্‌টে একই শিক্ষকগণ শিক্ষা দান করে থাকেন। উল্লেখ্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, প্রথমিক শিক্ষার পরিধি ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০১৩ সালে ৪৯১টি, ২০১৪ সালে ১৯১টি, ২০১৫ সালে ৭৭টি এবং ২০১৬ সালে ৪টি মোট ৭৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় সবটাই অবৈতনিক অর্থাৎ বিনা বেতনে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করে ৩৬,০১৫টি স্কুল সরকারি করা হয়। ২০১৩ সালে সরকার ২৫২৪০টি রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরত্ব দিয়ে ৫৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন- ৩-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১৯৭৪ সাল থেকে ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন "প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এই মর্মে আইন পাশ করা হয়। ১৯৯০ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামুলক) আইনে'র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইন বাস্তবায়নের জন্যে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ সদস্য বিশিষ্ট 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা–প্রচলিত ধারার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের জন্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই মাদ্রাসা শিক্ষায় ৫ বছরের কোর্স চালু রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান ইত্যাদির পাশাপাশি বিশেষ করে কুরআন হাদিস ইত্যাাদি শেখানো হয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০):

১. মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিশু শ্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
২. কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।

৩. শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
৫. শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
৬. শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৮. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৯. শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
১০. সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা

প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ:

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।
২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।
৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া।
৫. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সকুমার বৃত্তি ও নান্দনিকবোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ অর্জন করা।
৬. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা।
৭. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞান মনস্কতা অর্জন করা।
৮. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
৯. বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
১০. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।
১১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।
১২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।

১৩. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
১৪. স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।
১৫. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
১৬. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
১৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।
১৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।
১৯. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
২০. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।
২১. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।
২২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
২৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া।
২৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্বসম্পর্কে জানা।
২৫. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।
২৬. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করা।
২৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
২৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২৯. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত?
   ক. ৩৬০০০ টি
   খ. ৩৬০১০ টি
   গ. ৩৬০১৫ টি
   ঘ. ৩৬০২০ টি

২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয় কত সালে?
   ক. ১৯৮৫ খ্রী:
   খ. ১৯৮৭ খ্রী:
   গ. ১৯৮৯ খ্রী:
   ঘ. ১৯৯০ খ্রী:

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা কী? বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা দিন।
২. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ লিখুন।
৩. প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ ২.২: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, ঝরেপড়া এবং সমাপ্তিকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরেপড়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন।

শিক্ষা সকলের সমান অধিকার। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে সার্বজনীন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় সবটাই অবৈতনিক অর্থাৎ বিনাবেতনে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করে ৩৬,০১৫টি স্কুল সরকারি করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এই মর্মে আইন পাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সরকার ১৯৮১ সালে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করেন। ১৯৯০ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামুলক) আইনে'র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৯২ সালে ৬৮টি উপজেলাকে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের সকল উপজেলাকে এই আইনের আওতাধীন আনা হয়। এ আইন বস্তবায়নের জন্যে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ সদস্য বিশিষ্ট্য 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে (Alam, ২০০০:৪৩)।

তবে ১৯৭০ থেকে ৮০-এর দশকের প্রাথমিক শিক্ষার দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় যে, এই সময় শিক্ষার উন্নয়নের গতি ছিল মন্থর এবং এর সাথে শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধার অভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই সময় শহর ও গ্রাম গুলোর মধ্যে স্কুলে ভর্তি, স্কুলে উপস্থিতি, শিক্ষার হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রভেদ প্রকট ছিল। পরবর্তীতে ৯০ এর দশকে শিক্ষা কর্মসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এটি নিশ্চিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে WCEFAG অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সকল জাতি রাষ্ট্র গুলোকে শিক্ষা খাতে বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG)-এ স্বাক্ষর করে এবং ২০১৫ সালের ভিতর প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০০% নেট তালিকাভুক্তির হার নিশ্চিত করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেই লক্ষ্যে পরবর্তীতে সরকার শিক্ষাখাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

বর্তমানে দেশে ১১ ধরনের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে চলেছে। যথা:

দেশে প্রাথমিক স্তরে দু'টি উপধারা রয়েছে। (১) সাধারণ ও (২) ধর্মীয় মাদরাসা শিক্ষা। এ সব নিয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে ১১ (এগার) রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথা:

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
২. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৩. রেজিস্টার্ড নয়, এমন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৫. এবতেদায়ী মাদরাসা;
৬. দাখিল মাদরাসা ও সংশ্লিষ্ট এবতেদায়ী মাদরাসা;
৭. এন.জি.ও. স্কুল (যেমন- ব্রাক স্কুল);
৮. এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল (প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত স্কুল- এ গুলো সরকারি);
৯. কিন্ডার গার্টেন স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়);
১০. স্যাটেলাইট স্কুল (প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এমন গ্রামে ১ম-৩য় শ্রেণি সম্বলিত স্কুল);
১১. কমিউনিটি স্কুল (এলাকাবাসীর অনুদানে একজন শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল)।

দেশব্যাপী বিদ্যালয়গুলিতে তালিকাভুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝড়ে পড়ার হার নিম্নগামী, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সর্বোপরি জেন্ডার বৈষম্য প্রাথমিক শিক্ষা খাতে আক্ষরিক অর্থে হ্রাস পেয়েছে। মেয়ে শিশুরা ভর্তি, সমাপনী এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে ছেলে শিশুদেরকে হারিয়ে দিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তিতে উন্নতি এবং গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কিছু সংখ্যক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার একই ধারায় বৃদ্ধি পায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৮৫ ভাগ পড়াশোনা করে। এর পাশাপাশি রয়েছে সরকারের কাছ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্যপ্রাপ্ত এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যার অনেকাংশই বিদেশি দাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। নিট এবং গ্রস ভর্তি হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২৯ নভেম্বও ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,১৯,৩২,৬৩৮।

২০১৫ সালে নীট ভর্তির হার ছিল ৯৭.৯৪ শতাংশ এবং শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার ৭৯.৬ শতাংশ। ২০১৪ সালে জিইআর এবং এনইআর ছিল যথাক্রমে ১০৮.৪ শতাংশ এবং ৯৭.৭ শতাংশ। ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধিসহ প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার ২০১০ সালের ৬০ শতাংশ হতে ২০১৩ সালে ৭৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ঝরে পড়ার হার আকস্মিকভাবে ৪৭.২ শতাংশ হতে ২০.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। জেণ্ডার সমতা সূচক অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং ২০১৩ সালে এটি ছিল জিইআরের জন্য ১.০৩ এবং এনইআরের জন্য ১.০২। বিনামূল্যে পাঠ্যবই এবং প্রতি পরিবারে ১ শিশুর জন্য ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি উৎসাহিত করেছে। ৩৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম আরেকটি উদ্দীপক। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়েয়র অধীনে সমাজ সেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বৃত্তি কর্মসূচি শুরু করেছে যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে উৎসাহিত করছে। গুণগতমান ও সক্ষমতা উন্নত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী- ১: ২০০৫-২০১২ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তির পরিমাণ:

বছর	স্থুল তালিকাভুক্তি বা GER (%)			নেট তালিকাভুক্তি বা NER (%)		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০০৫	৯১.২	৯৬.২	৯৩.৭	৮৪.৬	৯০.১	৮৭.২
২০০৬	৯২.৯	১০৩	৯৭.৭	৮৭.৬	৯৪.৫	৯০.৯
২০০৭	৯৩.৪	১০৪.৬	৯৮.৮	৮৭.৮	৯৪.৭	৯১.১
২০০৮	৯২.৮	১০২.৯	৯৭.৬	৮৭.৯	৯০.৪	৯০.৮
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭

সারণী- ১ অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্থুল তালিকাভুক্তির হারের দিক দিয়ে ২০০৫ সালে ছাত্রের শতকরা হার ৯১.২ ও ছাত্রীর শতকরা হার ৯৬.২ এবং সর্বোমোট শতকরা হার ৯৩.৭। অপরদিকে ২০১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ছাত্রের শতকরা হার ১০১.৩ ও ছাত্রীর শতকরা হার ১০৭.৬ এবং সর্বোমোট শতকরা হার ১০৪.৪ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নেট তালিকাভুক্তির হারের দিক দিয়ে ২০০৫ সালে ছাত্রের শতকরা হার ৮৪.৬ এবং ছাত্রীর শতকরা হার ৯০.১ এবং সর্বোমোট শতকরা হার ৮৭.২। অপরদিকে ২০১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ছাত্রের শতকরা হার ৯৫.৪ ও ছাত্রীর শতকরা হার ৯৮.১ এবং সর্বোমোট শতকরা হার ৯৬.৭।

সারণী- ২: ২০০৫-২০১২ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির গড় হার:

বছর	শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির গড় হার		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০০৫	২৩	২২	২৩
২০০৬	২১	২০	২০
২০০৭	২০	১৯	২০
২০০৮	২০	১৮	১৯
২০০৯	১৮.২	১৭.২	১৮
২০১০	১৭.২	১৬	১৬.৫
২০১১	১৫.৫	১৪.৩	১৪.৯
২০১২	১৪	১৪	১৪

তথ্যসূত্র:http://www.banbeis.gov.bd

সারণী- ২ এ দেখা যায়, ২০০৫ সালে গড়ে প্রায় ২৩ জন ছাত্র এবং ২২ জন ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল এবং তা ২০১২ সালে উভয় ক্ষেত্রেই কমে এসে দাড়ায় ১৪ জনে। ২০০৫ সালে সর্বোমোট ছাত্র-ছাত্রী গড়ে প্রায় ২৩ জন অনুপস্থিত ছিল এবং ২০১২ সালে তা ১৪ জনে এসে দাড়িয়েছে।

সারণী- ৩ ঝড়ে পড়ার হার (২০০৫-২০১২)

Year	Dropout Rate (%)
২০০৫	৪৭.২
২০০৬	৫০.৫
২০০৭	৫০.৫
২০০৮	৪৯.৩
২০০৯	৪৫.১
২০১০	৩৯.৮
২০১১	২৯.৭
২০১২	২৬.২

তথ্যসূত্রঃ http://www.banbeis.gov.bd

সারণী ৩ অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ঝরে পড়ার শতকরা হার ছিল ৪৭.২ কিন্তু তা ২০০৬-০৭ এ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৫০.৫ এবং ২০০৮ এ ৪৯.৩। ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সেই হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫.১% - ২৬.২%। এই তথ্য ও উপাত্ত গুলো BANBEIS-এর সার্ভে রির্পোট এবং বিভিন্ন গবেষনাপত্রের উপর ভিত্তি করে সংগ্রহ করা হয়েছে। BANBEIS-এর তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তালিকাভুক্তির হার ২০০৫ সাল এর তুলনায় ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ৯৩.৭% থেকে উন্নীত হয়ে ১০৪.৪%। নেট তালিকাভুক্তির হার ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৭.২ % থেকে উন্নীত হয়ে ৯৬.৭% হয়েছে। অপরদিকে ঝড়ে পড়ার হার ২০০৫ এর ৪৭.২% তুলনায় ২০১২ তে হ্রাস পেয়ে ২৬.২% এ এসে দাড়িয়েছে, যা শিক্ষাখাতে এম ডি জি'র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিবাচকতাকে প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে?
   ক. ১২ ধরনের
   খ. ১১ ধরনের
   গ. ১০ ধরনের
   ঘ. ০৯ ধরনের

২. বাংলাদেশে কতসালে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৯৮১
   খ. ১৯৯১
   গ. ১৯৭১
   ঘ. ২০০১

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তিও বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরেপড়ার চিত্র তুলে ধরুন।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরেপড়ার কারণ বর্ণনা করুন।
৫. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ঝরেপড়া সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করুন।

পাঠ ২.৩: প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাচীন, মধ্য ও ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়নের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশে সরকারের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।

ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে আদিবাসী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মতবাদে প্রভাবিত ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি ইংরেজরাই মূলতঃ এ দেশে সেই ধারার প্রবর্তন করে। এক্ষেত্রে ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম এ্যাডাম একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি তাঁর সুপারিশসমূহে জেলাসমূহ থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রতি জেলায় ১ জন করে পরীক্ষক নিয়োগ করে তাঁর মাধ্যমে শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নর্মাল স্কুল স্থাপন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষকদের উৎসাহদানের জন্য ভূমি দান ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৫৪ সালে উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ রচিত হয়। এই ডেসপ্যাচের উল্লেখযোগ্য দিক হল সরকারি কাঠামোধীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। সে অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে জনশিক্ষা পরিচালকের অধীনে পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়। লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কিছুটা প্রভাব বিস্তৃত করেন। ১৯১০ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আইন পরিষদে একটি বিল পেশ করেন। এই বিলটি ১৯১২ সালে নাকচ হয়ে যায়। বিলটি তখন পাশ না হলেও পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে শুধুমাত্র পৌর এলাকার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। ১৯২১ সালের ভারত শাসন আইনে আংশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকৃতির ফলে ১৯৩০ সালে পল্লী এলাকার জন্য বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট প্রণীত হয়। কিন্তু এক দশক জুড়ে সত্যিকার অর্থে এর কোন প্রয়োগ হয়নি। পরবর্তীতে এই এ্যাক্টের আওতায় ১৯৩৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিশন (১৯৪৪) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সার্জেন্ট কমিশন রিপোর্ট প্রথম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

ভারত বিভক্তির পর সর্বজনীন বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি রেজ্যুলেশন জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে (১৯৪৭) উপস্থাপন করা হয়। সেই সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫০ সালে সরকার জেলা স্কুল বোর্ডগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করে। সাবেক ডেপুটি কমিশনারকে নবগঠিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রশাসন এবং সাবেক জেলা বিদ্যালয়

পরিদর্শককে এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ১৯৩০ সালের বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারী এডুকেশনার অ্যাক্ট, ১৯৫১ সালে ইষ্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট নামে সংশোধন করা হয়। সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু নির্বাচিত সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিল এলাকায় ৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 'কম্পালসরি প্রাইমারী স্কুল' হিসেবে এবং বাকী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 'নন-কম্পালসরি' হিসেবে পরিচালনা করা হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মেয়াদকাল ৪ বছর ছিল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকাল ৪ বছর থেকে ৫ বছরে উন্নীত করা হয়। কম্পালসরি ও নন-কম্পালসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বিভক্ত হওয়ার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর ফলে, সরকার ১৯৫৭ সালে ৫০০০ সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিল একালার কম্পালসরি বিদ্যালয়কে মডেল এবং বাকী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নন-মডেল নামকরণ করে এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নন-মডেল স্কুলসমূহ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান আমলের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৫৯ সালে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এ শিক্ষা কমিশন ১৫ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ বছর পর্যন্ত উন্নীতকরণ ও বয়োঃক্রমভিত্তিক নমনীয় প্রমোশন প্রদানের সুপারিশ জানায়। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে অধিক বরাদ্দ এবং বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ শিক্ষার্থী অর্ভির হার বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নন-মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এবং স্কুলের নামের পূর্বে নন-মডেল নামটির সংযোজন কিছু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সরকার ১৯৬৫ সালে মডেল ও নন-মডেল স্কুলকে একীভূত করে 'ম্যানেজড ফ্রি প্রাইমারী স্কুল' হিসেবে ঘোষণা করে। এই নতুন ব্যবস্থায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একই ধারার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সকল শিক্ষকের বেতনক্রমে নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রথম দায়িত্ব হিসেবে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে আইন পাশ করা হয় এবং জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলোতে কর্তব্যরত পাঁচজন শিক্ষককে (প্রতি স্কুল থেকে) সরকারী চাকুরে হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

১৯৭৩ সালে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা করে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষা বিষয়ে যে সকল উদ্দেশ্য স্থির করা হয় তার ভেতর একটি ছিল স্কুল গমনোপযোগী সকল শিশুকে আনুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে, যা অন্তত প্রাথমিক স্তরের নিম্নে হবেনা। এই পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতের মোট অর্থের ৫৭.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এর পরিমাণ ছিল মোট শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা আঠার ভাগ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের আংশিক বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও পাঁচ হাজার বৃদ্ধি পেলেও ১৯৭৩-৭৪ সালে তিন হাজার সাতশো ঊনপঞ্চাশটি (৩,৭৪৯) প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ কর্মসূচির বহির্ভূত থেকে যায়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭৩ সালে ছিল ৭.৮ মিলিয়ন যা ১৯৭৮ সালে ৮.২ মিলিয়নে উন্নীত হয়। উল্লেখিত সময়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২.৭ মিলিয়ন হতে ৩ মিলিয়নে উন্নীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সংখ্যা ১৯৭৩ সালে এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ জনের (১,৫৫,৭৪২) নির্দিষ্ট ছিল, তা ১৯৭৩ সালে বেড়ে এক লাখ ছিয়াশি হাজার একশ

চুয়ান্ন জনে (১,৮৬,১৫৪) পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের সংবিধানে ১৯৭২ সালেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়:

রাষ্ট্র

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।
খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।
গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সেই নব্য স্বাধীন দেশের সরকার বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পূনর্গঠনের জন্য ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন প্রস্তাব করেন যে, দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। আর আজকের দিনে পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে দ্রুত প্রসার ঘটছে তাতে সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য অন্তত আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রয়োজন। এ কারণে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা রূপে গণ্য করে তাকে সার্বজনীন করতে হবে।

কমিশন অরও প্রস্তাব করে, যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এক অভিন্ন ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নৈশ স্কুল চালু করতে হবে। অবশ্য কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগেই ১৯৭৩ সালে সরকার দেশের ৩৬,০১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করে।

১৯৭৫ সালে পট পরিবর্তনের পর এই কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৮০ সাল থেকে দেশব্যাপী যে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছিল তাও ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের সময় বাতিল করা হয়। তবে তারপরও কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাস্তায়নের জন্য জনসাধারণের চাপ বাড়তে থাকে। ফলে ১৯৮৭ সালে সরকার ড. মফিজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে আরেকটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করনে। এ কমিশন ১৯৮৮ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামুলক এবং ২০০০ সাল নাগাদ ৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ (৪৬%) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য নির্ধারিত হয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) সরকার কর্তৃক সমন্বিত স্কুল উন্নয়ন নামে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। এতে প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সার্বিকভাবে উন্নত করার পরিকল্পনা ছিল এবং এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রায় এক হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা এবং প্রতি বছর প্রত্যেক উপজেলায় কয়েকটি করে প্রাথমিক স্কুলের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করার কথাও উল্লেখ ছিল।

১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার দুশ পাঁচটি (৪৪,২০৫)। তার মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাইত্রিশ হাজার তিনশ একচল্লিশটি (৩৭,৩৪১) অর্থাৎ শতকরা চুরাশি ভাগ (৮৪%) এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয় হাজার আটশ চৌষট্টিটি (৬,৮৬৪) অর্থাৎ শতকরা ষোল ভাগ।

অবস্থান ভিত্তিক বিদ্যালয়ের তথ্যে জানা যায় যে, গ্রাম পর্যায়ে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার চারশ তেষট্টিটি (৪১,৪৬৩)। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পয়ত্রিশ হাজার দুশ একান্নটি (৩৫,২৫১) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয় হাজার দু'শ বারটি (৬,২১২)। শহর পর্যায়ে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই হাজার সাতশ বিয়াল্লিশটি (২,৭৪২)। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই হাজার নব্বইটি (২,০৯০)। বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছশ পঁচিশটি (৬২৫)।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে 'জেনারেল এডুকেশন প্রোগ্রাম'-এর আওতায় সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত স্কুল তৈরী এবং স্কুল সংস্কার করা, স্যাটেলাইট স্কুল পাইলট প্রোগ্রাম এর প্রবর্তন এবং আনুষ্ঠানিক ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রোগ্রাম এর কাজ চলে। ১৯৯০ সালে ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেন এবং ৬ ফেব্রুয়ারী তা বাস্তবায়নের সরকারী অনুমোদন দেয়া হয়। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯২ সালে ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৩ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশের অবশিষ্ট সকল থানায় বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম একযোগে শুরু হয়। এ আইন বস্তবায়নের জন্যে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ সদস্য বিশিষ্ট্য 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৯২ সালে মন্ত্রণালয় লেভেলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে (Alam, ২০০০:৪৩)।

তবে ১৯৭০ থেকে ৮০ এর দশকের প্রাথমিক শিক্ষার দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় যে, এই সময় শিক্ষার উন্নয়নের গতি ছিল মন্থর এবং এর সাথে শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধার অভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই সময় শহর ও গ্রাম গুলোর মধ্যে স্কুলে ভর্তি, স্কুলে উপস্থিতি, শিক্ষার হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রভেদ প্রকট ছিল। পরবর্তীতে ৯০ এর দশকে শিক্ষা কর্মসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এটি নিশ্চিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে WCEFAG অংশগ্রহণে এর মাধ্যমে। এই কনফারেন্সে অংশগ্রহনকারী সকল জাতি রাষ্ট্র গুলোকে শিক্ষাখাতে বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) এ স্বাক্ষর করে এবং ২০১৫ সালের ভিতর প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০০% নেট তালিকাভুক্তির হার নিশ্চিত করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেই লক্ষ্যে পরবর্তীতে সরকার শিক্ষাখাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যারফলশ্রুতিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের ন্যূনতম শিক্ষার চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে সরকার ২ জুন, ২০০৩ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করাসহ সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাার সুপারিশ করা হয় যা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়নের শুরু হয়ে গেছে। ২০১৩ সালে প্রায় ২৫২৪০ টি বেসরকার্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরত্ব দিয়ে ৫৮ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন- ৩-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়াও সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার স্যাটেলাইট এবং কমিউনিটি স্কুল, আনন্দ স্কুল চালু, শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি চালু, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন, অভিভাবক ও SMC মেম্বারদের অংশ গ্রহণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উইলিয়াম এ্যাডাম এর শিক্ষা রিপোর্ট কত সালে প্রকাশ করেন?
ক. ১৮৩০ খ্রী:
খ. ১৮৩৫ খ্রী:
গ. ১৯৩৫ খ্রী:
ঘ. ১৯৪৫ খ্রী:

২. ১৯৫১ সালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মেয়াদকাল কত ছিল?
ক. ৩ বছর
খ. ৪ বছর
গ. ৫ বছর
ঘ. ৬ বছর

৩. জেনালে এডুকেশন শিক্ষা সুযোগের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য–
i. অতিরিক্ত স্কুল তৈরি ও সংস্কার করা
ii. স্যাটেলাইট স্কুল প্রবর্তন করা
iii. কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রবর্তন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও ii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন, মধ্য ও ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণনা দিন।
২. পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরুন।
৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়নের বিবরণ দিন।
৪. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করুন।
৫. প্রাথমিকশিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশে সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ২.৪: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশমালা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখিত প্রাথমিক শিক্ষরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নয়ন রূপকল্প, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী,
স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পূনর্গঠনের জন্য ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট পেশ করে। কুদরত-ই-খুদা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অষ্টম শ্রেণি পযন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, প্রাথমিক স্তরে অধিক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির সম্প্রসারণ, যথোপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনসহ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

১৯৭৩-৭৮ মেয়াদে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী স্থাপন ও ৫১টি পিটিআই এর উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম। এই পরিকল্পনা কালে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে অন্তর্তীকালীন শিক্ষানীতি (১৯৭৯) প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশসহ বাস্তবায়িত হয়নি বলে শিক্ষার বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যার উপর আলোকপাত করে এই কমিটি সরকারের নিকট প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করা এবং ১৯৭৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা, বছরে ৩০,০০০ করে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা, ১ঃ২৫০ ছাত্র অনুপাতে বিদ্যালয় স্থাপন করা, প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি স্থানীয় সরকারের হাতে অর্পণ, মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করাসহ বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

১৯৮০-৮৫ মেয়াদে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বাংলাদেশের প্রাথমিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ। এ সময়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প দুটি হলো: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (আইডিএ সাহায্যপুষ্ট) এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (জাতীয়)। আইডিএ-এর সহায়তায় ৪৪টি থানায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এই দু'টি প্রকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যের মধ্যে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন, সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার ১৮৩৪টি পদ সৃষ্টি করে মাঠ পর্যায়ে তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ, পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, কর্মকর্তা

ও শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রবর্তন, ৫০০ মহিলা শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, গোটা দেশের জন্য স্কুল মানচিত্র প্রণয়ন কার্যক্রম সমাপ্তিকরণ, বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইউনিফর্ম বিতরণ ও বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনা (১৯৮৫-৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এগুলোর মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ বন্যা পূনর্বাসন প্রকল্প নামে একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের স্থিতি নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উন্নততর প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংশোধন, পুনর্বিন্যাস ও পরিমার্জন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-এর উন্নয়ন এবং সীমিত পরিমাণে আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম বাহন হিসাবে চিহ্নিত করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলো হচ্ছে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, প্রাথমিক স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, একাডেমিক সুপারভিশন এবং প্রশাসনিক পরিদর্শন কাজের প্রবর্তন। এই পরিকল্পনা মেয়াদে ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন পাশ করা যায়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৬-১০ বছরের শিশু) কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালের শেষ দিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোষ স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালে ৬৮টি উপজেলা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। এ কার্যক্রমের আশাব্যঞ্জক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৩ সালে সারাদেশকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা বিধান, বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সাফল্য বৃদ্ধিকল্পে এ পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭ থেকে ২০০২)

দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও সকল স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়নে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সবার জন্য শিক্ষা (Education for All) কর্মসূচির জন্য সরকার একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষায় দুটি বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যথা: স্কুল ভর্তির হার ১০০% এ উন্নীত করা। এ জন্য মেয়েদের ভর্তির উপর বিশেষ জোর দেয়া। অন্যটি হল ২০০২ সাল নাগাদ সমাপন হার অন্তত ৭৫% নিশ্চিতকরণ। এছাড়া এই মেয়াদে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার গুণগতমান উন্নীত করা, চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রম আধুনিক ও পরিমার্জন করা, উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, ন্যাপ, ডিপিই, এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা কমানো এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP) নামক একটি ছাতা প্রকল্পের

অধীনে এসব কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এ মেয়াদী পরিকল্পনায় প্রাথমিক উন্নয়ন খাতে ৬৮, ৫৯৪ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ধরা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রয়েছে। নিম্নে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা তুরে ধরা হল।

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের জন্যশিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল–প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ কাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না; তবে ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব; এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়নঃ

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থপনা করা। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:
   - প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
   - প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক্রম বিস্তারণসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
   - শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পনুর্বির্নাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনসুরণ করে ২০১৮ এর মধ্যে আট বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা

বাস্তবায়ন, ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা-নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

২. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ, প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা– সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরোজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদ্রাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নিধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।

৩. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদ্রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হবে। সাধারণ, কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজী মাধ্যম ও সব ধরনের মাদ্রাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়ম নীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

৫. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন সহজপাঠ ও অনুশীলন পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণিসমূহে প্রয়োজন অনুসারে তা জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন ও পরিবেশ-উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়ার সুযোগ না পেলে, এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

ভর্তির বয়স

৬. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১: ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

আদিবাসী শিশু

আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে। আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। আদিবাসী-অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা, তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকে নজর দেয়া হবে।

প্রতিবন্ধী শিশু

সব ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী বান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন– শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য।

এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে পরিকল্পিত কর্মসূচির ভিত্তিতে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

শিক্ষণ পদ্ধতি

শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে আপাততঃ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী নারী বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণিতে নারী শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হবে। যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে এ সকল

শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি-ইন-এড/বিএড অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং যোগদানের পর সর্বোচ্চ তন বছরের মধ্যে সি-ইন-এড/বিএড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল যথোপোযুক্ত বিন্যাস করে (যথা– সহকারি শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে, পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।

এছাড়া শিক্ষক নির্বাচন, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কৌশলসহ প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-১০১৫)

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শিক্ষাগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ রূপকল্প- ২০২১ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং গ্রেড- ৮ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্ধিত করা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্মত একটি প্রজন্ম তৈরি, শিক্ষকদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক; গুণগত মানের সার্বিক উন্নতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষা নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকে হলো এতে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওপিএমই) তৃতীয় প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি- ৩) চালু করে। পিইডিপি- ৩ একটি পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি যা 'সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ (এসডব্লিউএপি)' ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে চালু হয়। এতে শিক্ষণের ফলাফল, অংশগ্রহণ, বৈষম্য হ্রাস, বিকেন্দ্রীকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের কার্যকর ব্যবহারের পাশাপাশি কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়। পিইডিপি– ৩ এ শিক্ষা সমাপ্তির হার এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে সম্পদের কার্যকর ব্যহারের ওপর অধিকতর জোর দেয়া হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০১৯)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নয়ন রূপকল্প, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি)- ২০১০ সরকারের বর্তমান শিক্ষা দর্শনে বিধৃত রয়েছে। এই নীতি সরকারের প্রতিশ্রুত 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা থেকে আহরিত। এনইপি অনুযায়ী প্রস্তাবিত পরিবর্তনে ১ বছরের প্রাক–প্রাথমিক এবং ২০১৮ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা মোট ৮ বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে:

১. বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির উন্নয়ন

শিক্ষার মান উন্নয়ন কৌশলে শিক্ষক নিয়োগ, তাদের কর্মজীবন ধারা, প্রশিক্ষণ, পেশাগত সহায়তাদান এবং পারিশ্রমিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীদের ফলাফল অর্জনের মূল্যায়নে সমাপনী পরীক্ষা এবং শিক্ষকদের দ্বারা ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হবে। জাতীয় মূল্যায়নের লক্ষ্য হবে মুখস্থ করার পরিবর্তে জ্ঞানলাভ, কার্যকর এবং দক্ষতার ক্ষেত্র শক্তিশালী করা। প্রাথমিক সমাপ্তি পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি করা হবে। একই মূল পাঠ্যক্রম সকল সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় অনুসরণ করা হবে।

এই লক্ষ্যের আওতায় নিম্নে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে:

- সারাদেশে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা কর্মসূচির মূলধারায় আনা;
- শিক্ষকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ;
- বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা;
- সকল ধরনের বিদ্যালয়ে সব শিশুদের মানসম্পন্ন পাঠ্যবই প্রদান;
- অডিও-ভিজুয়াল উপকরণসহ সব বিদ্যালয়ে আইসিটি চালু করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষণ বিজ্ঞানে মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং বৈষম্যহ্রাস

বিদ্যলয়ের জন্য প্রস্তুতি ও পরবর্তী কর্মসম্পাদন এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের কর্তৃত্বের ওপর প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য ১ বছরের প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচি তৈরি করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। শিশুদের অপর্যাপ্ত পুষ্টি সমস্যার সমাধান করতে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। শৈশব হতে পুষ্টির অভাব প্রায়ই দক্ষ শ্রমের উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। সুতরাং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে প্রাথমিক পর্যায় হতে পুষ্টি বিষয়ক সমস্যার সুরাহা হতে পারে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনে সহায়ক হবে। প্রবেশাধিকারের বিষয়টিতে নাগালের বাইরে থাকা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, শ্রমজীবী শিশু, কঠিন পরিস্থিতিতে আটকে পড়া শিশু, সংখ্যালঘু নৃ-জনগোষ্ঠীর শিশু অথবা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের ওপর জোর দেয়া হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের তাদের মাতৃ ভাষায় জ্ঞানার্জন করতে উৎসাহিত করা হয়।

এই লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়:

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্যসহায়তা বৃদ্ধি;
- সকল বিদ্যালয়কে সামাজিক গতিময়তার সাথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করা;
- জরুরি সময়ে সহায়তা প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ১০০% উপবৃত্তি প্রদান;
- সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সম্প্রসারণ;
- অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ।

৩. বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সামগ্রিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বিদ্যালয় ব্যস্থাপনা কমিটিকে আরো কর্তৃত্ব দেয়া হবে। ব্যবস্থাপনা এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করা হবে। বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা সহায়ক হবে:

- স্থানীয় কমিউনিটির সহায়তা নিয়ে বিদ্যালয় তহবিল (এসএলআইপি) বৃদ্ধিকরণ;
- প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দ্রুততার সাথে শূন্যপদ পূরণ এবং আরো শিক্ষক নিয়োগ;

- প্রতি বছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি পরিচালনা;
- পঞ্চম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জাতীয় মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা।

৪. কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিতাসহ অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা হবে এবং এভাবে বিদ্যালয়গুলোর বৃহত্তর কর্তৃত্ব যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত হবে। এই প্রক্রিয়া সহজতর করতে নিম্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

- স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন;
- কর্মক্ষমতা ও প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন দ্বারা মানবসম্পদ উন্নয়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতভাগ ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারিত হয়?
ক. ৭০%
খ. ৮০%
গ. ৯০%
ঘ. ১০০%

২. ১৯৯০ সালে কতটি উপজেলা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়?
ক. ৬০ টি
খ. ৬৪ টি
গ. ৩৮ টি
ঘ. ৭২ টি

৩. আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কত সালের মধ্যে নিশ্চিত করা হবে?
ক. ২০১৭ খ্রী:
খ. ২০১৮ খ্রী:
গ. ২০১৯ খ্রী:
ঘ. ২০২০ খ্রী:

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপের বিবরণ দিন।
৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ উল্লেখিত প্রাথমিক শিক্ষরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বর্ণনা করুন।
৪. বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ব্যাখ্যা করুন।
৫. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নয়ন রূপকল্প, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৫: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের বর্তমান চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো অঙ্কন করতে পারবেন।
- উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো অঙ্কন করতে পারবেন।
- জেলা শিক্ষা অফিসের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অঙ্কন করতে পারবেন এবং এর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাযাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০০৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন একজন প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট। এ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আরও একটি অধিদপ্তর রয়েছে। এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে পরিচিত। এটি বিভিন্ন ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলা অফিস, ৪৮১টি উপজেলা/থানা অফিস, ৫৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের জন্য যাবতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।
৩. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন।
৪. অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ গণশিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা।
৫. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ।
৬. সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ।
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় সংস্কারমূলক নীতি প্রণয়ন।
৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য কারিকুলাম উন্নয়ন।
৯. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ।
১০. সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে, যেমন– জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প উপস্থাপন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
১১. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করা।
১২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত সংস্থগুলোকে সমর্থন দেয়া; গণশিক্ষা গবেষণা কাজে অর্থায়ন করা।
১৩. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিল ব্যবস্থাপনা।
১৪. গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করা।
১৫. বিভাগের সচিবালয় প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা তদারকিসহ বিভাগের অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
১৬. বিভাগের যেকোনো অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৯৮১ সনের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরটি বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাস্তবায়ন সংস্থা (Implementing Directorate) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিদপ্তর এবং এর অধঃস্তন অফিসসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য দায়ী থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান হলেন একজন মহাপরিচালক। অধিদপ্তরের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসকে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

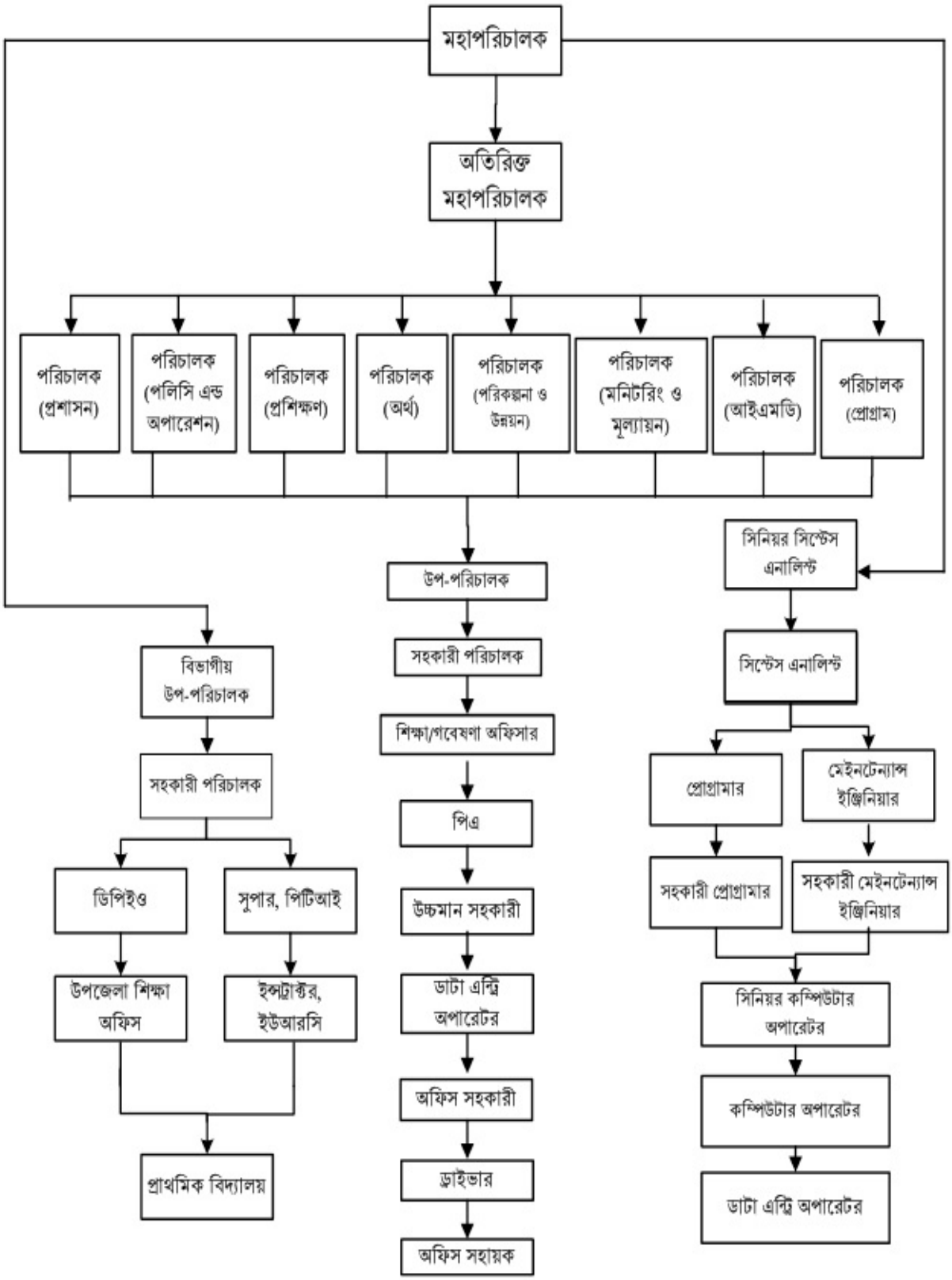

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন।
২. সুষ্ঠুভাবে কার্য-সম্পাদনের জন্য অধিদপ্তরের প্রতিটি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরকারি নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান।
৩. বিভাগীয় ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসমূহকে দায়িত্ব ও নির্দেশনা প্রদান ও অর্থ বরাদ্দকরণ।
৪. বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী নিয়মাবলি (Standing Orders) জারি করা।
৫. অধিদপ্তরের অধীন অফিসসমূহের কার্যাবলি তদারক করা।
৬. উপজেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সরকারি বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান।
৭. বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন ও এতদসম্পর্কিত প্রশাসন ও ব্যবস্থা।
৮. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দান।
৯. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
১০. অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা।
১১. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (PTI) ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (NAPE)-এর প্রশাসন ও উন্নয়ন।
১২. অধিদপ্তরের অধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতি।
১৩. অধিদপ্তরের অধীন কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি এবং শৃংখলা বিষয়ক কার্য-সম্পাদন এবং
১৪. আন্তঃঅধিদপ্তর যোগাযোগ।

গ. বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়

বর্তমানে দেশের প্রশাসনিক প্রতিটি বিভাগে একটি করে মোট ৭টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয় রয়েছে। এ কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হলেন বিভাগীয় উপ-পরিচালক। এ ছাড়াও ১জন সহকারি পরিচালক ও ১জন শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। উপ-পরিচালক, সহকারি পরিচালক ও শিক্ষা অফিসারকে অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও নিয়মিত নির্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় ও অধঃস্তন কার্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এ কার্যালয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন এ কার্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুর জন্য এ কার্যালয় থেকে অনুমতিপত্র জারি করা হয়। অস্থায়ী ও স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বও এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি এ অফিস থেকেও আওতাধীন পিটিআইগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। বিভাগের মধ্যে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলীর দায়িত্বও এ কার্যালয় পালন করে থাকে।

বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

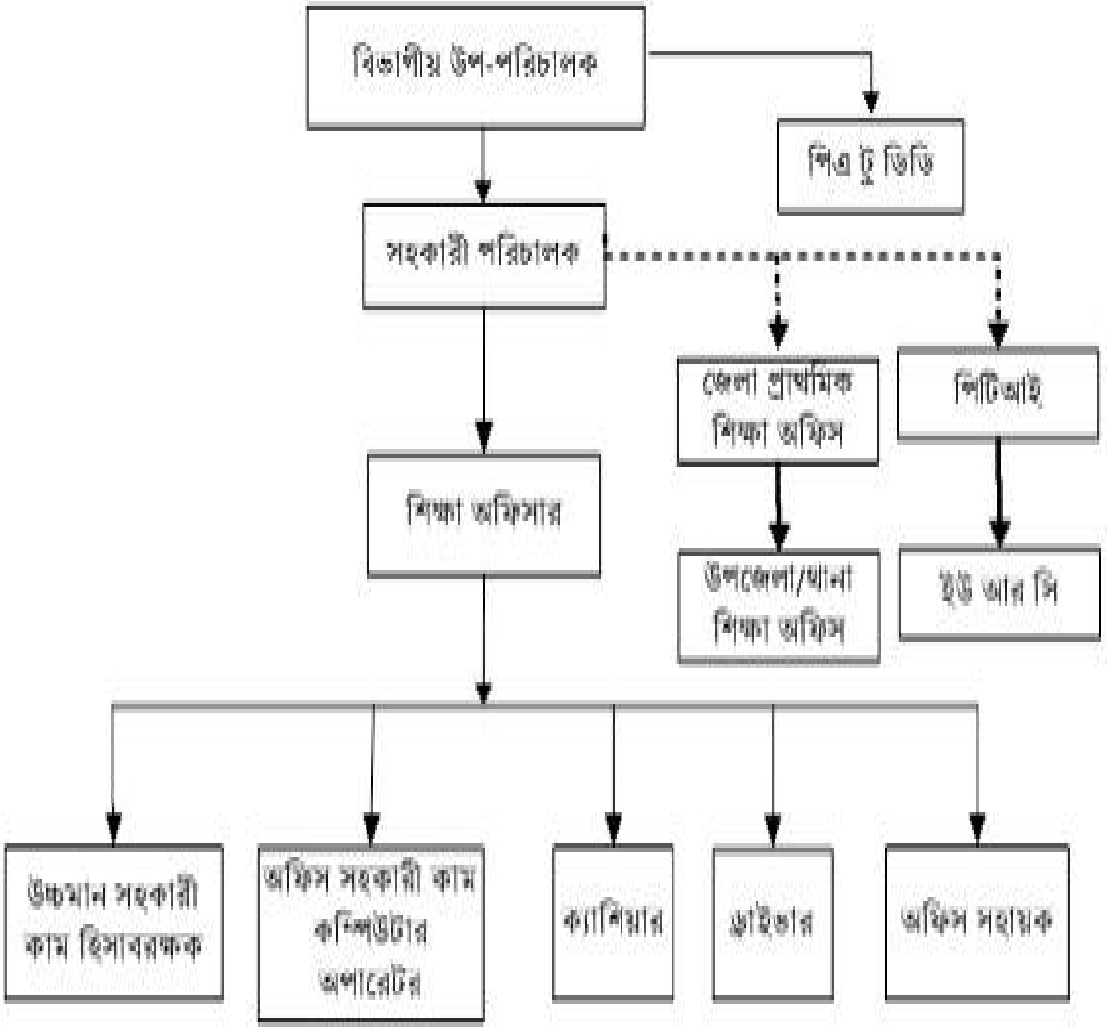

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

দেশের ৬৪টি জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠিত। মহাপরিচালকের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে জেলাস্থ প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ডে এ দপ্তরটি জড়িত রয়েছে। এ কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও)। তার অধীনে একাধিক সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন সহকারি মনিটরিং অফিসার ছাড়াও উচ্চমান সহকারি, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারি কাম টাইপিস্ট, একজন ড্রাইভার, নৈশ প্রহরী ও এমএল এসএস রয়েছে। জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ডিপিইও-কে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় ও অধীনস্থ উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করতে হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত বিভিন্ন বিভাগবহির্ভূত কমিটির সদস্য হিসেবে ডিপিইও-কে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদালয়সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন ও মনিটরিং করা ও নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন বুঝে নেয়ার দায়িত্বও ডিপিইও-কে পালন করতে হয়।

জেলা পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

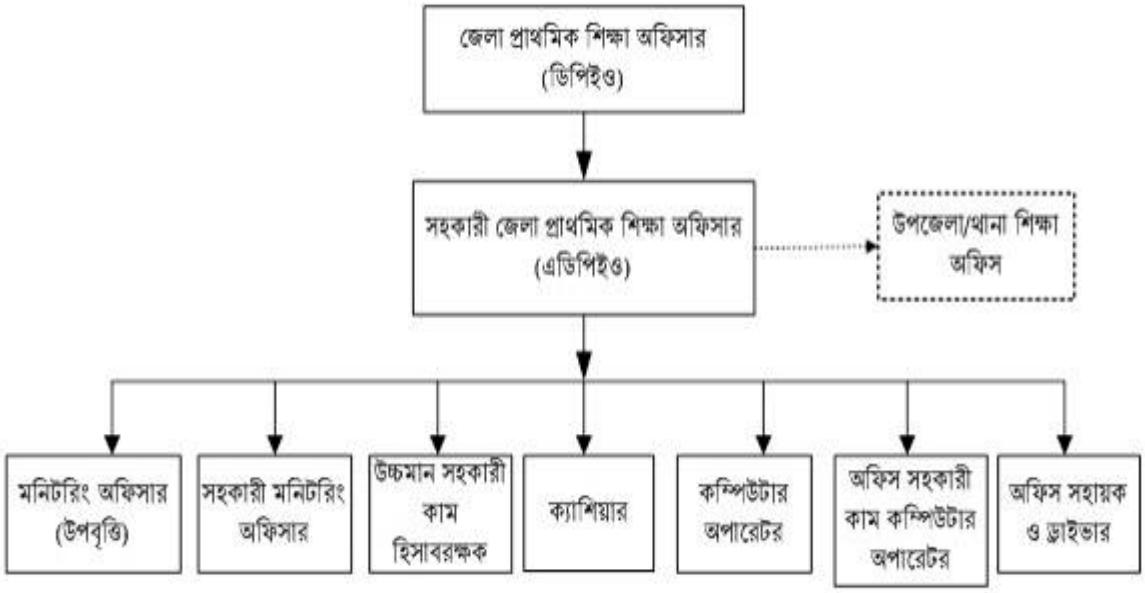

২০০৪ সালের এপ্রিলে জারিকৃত সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও)-এর প্রধান দায়িত্ব হলো:

১. জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নেতৃত্ব দেয়া;
২. বার্ষিক পরিকল্পনা করা;
৩. উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের পারফরমেন্স বা পারদর্শিতা পরিবীক্ষণ করা;
৪. এই উদ্দেশ্যে মাসে ৩টি উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করা;
৫. এ ছাড়াও মাসে ৩টি স্কুল সরেজমিনে পরিদর্শন করা;
৬. উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে মাসে একটি সভা করা;
৭. শিক্ষকদের নিয়োগকর্তা হিসেবে নিয়োগ-পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব হিসেব দায়িত্ব পালন করা;
৮. উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের এসিআর বা বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লেখা;
৯. উপজেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা;
১০. উপজেলা পর্যায়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম তদারকি করা;
১১. ইউআরসি পরিচালনায় পিটিআই সুপারকে সহায়তা করা।
১২. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

উপজেলা শিক্ষা অফিস

এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক দপ্তর। এ দপ্তরের দায়িত্বে থাকেন একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার। সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থিত সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর প্রশাসনিক বিষয়গুলো এ দপ্তর থেকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসে বেশ কয়েকজন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার (GBDBI) থাকেন। এ পদের সংখ্যা নির্ধারিত হয় বিদ্যালয়ের সংখ্যার ওপর। সাধারণত ১৫-২০টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠন করা হয়। প্রতিটি ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকেন একজন করে এইউইও।

উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

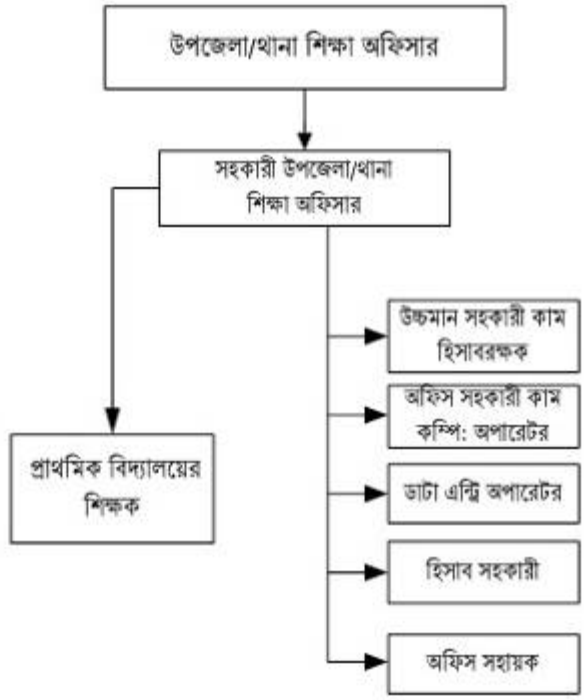

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বসমূহঃ

২০০৪ সালের এপ্রিলে জারিকৃত সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে যেসব প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানিক দায়িত্ব পালন করার কথা তার প্রধান প্রধানগুলো নিম্নরূপ:

১. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বার্ষিক ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন;
২. এসএমসি ও পিটিএ গঠনে এবং তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন;
৩. সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের জন্যে ক্লাস্টার বরাদ্দ করবেন;
৪. প্রতিমাসে কমপক্ষে ৫টি স্কুল ভিজিট করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন;
৫. নির্ধারিত সময়ে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করবেন;
৬. সহকারি অফিসারগণের নিয়মিত এ্যাকাডেমিক সুপারভিশন নিশ্চিত করবেন;
৭. উপজেলা পর্যায়ে চলমান সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন;
৮. প্রতিমাসে অন্তত একটি সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন;
৯. বছরে ৩বার (এপ্রিল, আগস্ট ও ডিসেম্বরে মাসের ১১ তারিখ) উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয় সভার আয়োজন করবেন;
১০. উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করবেন;
১১. নীতিমালা মোতাবেক উপবৃত্তি বণ্টন তদারক করবেন এবং অর্থ বন্টনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন;
১২. উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন;
১৩. বার্ষিক সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করবেন;
১৪. বিদ্যালয় বিষয়ক তথ্যসমূহ প্রদর্শন করে উপজেলার একটি মানচিত্র নিজ কক্ষে টাঙ্গিয়ে রাখবেন;
১৫. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ব্যাপক দায়িত্ব পালনে তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছে ক্লাস্টারভিত্তিতে সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার। ২০০৪ সালে ২১ এপ্রিল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার–এর দায়িত্বগুলো হলো:

১. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সহযোগে বার্ষিক ও মাসিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবেন; এ পরিকল্পনায় প্রতিমাসে ১০টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক তত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্বাবধানের জন্য একদিন ব্যয় করতে হবে, যাতে সকল বিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয় পর্যায়ক্রমে তত্বাবধান করা যায়;
২. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন;
৩. বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্বাবধান শেষে বিদ্যালয় উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত-বিনিময় করবেন;
১. একাডেমিক তত্বাবধান সমাপান্তে নির্ধারিত ছকে একটি সার-সংক্ষেপ তৈরি করে তা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট অবশ্যই প্রেরণ করবেন;
৫. প্রতি বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্বাবধান শেষে প্রধান শিক্ষককে সংক্ষিপ্ত ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন;
৬. সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি দু'মাস অন্তর সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করবেন;
৭. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে (ইউআরসি) প্রদান করবেন;
৮. সুষ্ঠু কার্য-ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও পেশাগত আলোচনার অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করার জন্যে ক্লাস্টারের প্রধান শিক্ষকদের জন্যে মাসে একটি সভার আয়োজন করবেন;
৯. বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও তাদের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন;
১১. বিদ্যালয় একাডেমিক তত্ত্বাবধানের সময় এসএমসির সদস্যদের সাথে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করবেন;
১২. বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক 'হোম ভিজিট' নিশ্চিত করবেন। তিনি নিজেও মাসে মোট তিনজন শিশুর বাড়ি ভিজিট করবেন। ভিজিটের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছক পূরণ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট তা দাখিল করবেন;
১৩. প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন;
১৪. ক্লাস্টারের প্রধান শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন করবেন এবং শিক্ষকদের অন্যান্য ছুটির বিস্তারিত বিবরণ মতামতসহ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;
১৫. বিদ্যালয় এলাকার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর জরিপ যাতে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করবেন;
১৬. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য

১৯৮৬ সালের সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. স্কুলের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন।

২, স্কুল এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের বাৎসরিক জরিপের কাজ শিক্ষকমণ্ডলী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করবেন এবং শিশু জরিপের স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

২. শিক্ষকমণ্ডলী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈনিক ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

৪. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং এর আলোকে সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন।

৫. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে স্কুলে যতজন শিক্ষক ততভাগে ভাগ করে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে এক একটি শাখার বাৎসরিক পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করে শাখা শিক্ষককে তার শাখার শিশুদের পাঠোন্নতির দায়িত্ব দেয়ার জন্য দায়বদ্ধ করবেন।

৬. সহকারি শিক্ষকগণ যাতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করবেন।

৭. প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও রিটার্ন নিয়মিত প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথানিয়মে প্রেরণ করবেন।

৮. পাঠোন্নতির লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার নিমিত্তে সহকারি শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতিমাসে অন্ততঃপক্ষে ২টি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

৯. মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন করবেন।

১০. সহকারি শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

১১. শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষকদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণপূর্বক সফলতা অর্জনে সাহায্য করবেন।

১২. সরকার ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ, আসবাবপত্র, শিক্ষাপোকরণ ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশবুক ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

১৩. ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর দিন-তারিখ ও বিষয় শিক্ষকদেরকে যথাসময়ে জানিয়ে দিবেন। ক্লাস্টার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের জন্য সব রকম আয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমন: বসার জায়গা, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?
   ক. ২০০১ খ্রী:
   খ. ২০০২ খ্রী:
   গ. ২০০৩ খ্রী:
   ঘ. ২০০৪ খ্রী:

২. কয়টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠন হয়?
   ক. ১০-১৫ টি
   খ. ১৫-২০ টি
   গ. ২০-২২ টি
   ঘ. ২২-২৫ টি

৩. সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে মাসিক কতটি বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করতে হয়?
   ক. ৮ টি
   খ. ১০ টি
   গ. ১২ টি
   ঘ. ১৪ টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. খ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের বর্তমান চিত্র তুলে ধরুন।
২. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো তুলে ধরুন।
৩. উপলো পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো অঙ্কন করুন।
৪. জেলা শিক্ষা অফিসের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৫. প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অঙ্কন পূর্বক এর কার্যাবলির বিবরণ দিন।
৬. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাযাবলি বর্ণনা করুন।
৭. প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৬: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থায়ন
Financing Primary Education in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাথমিক শিক্ষার অর্থায়নের উৎসসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শিক্ষা বাজেট বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একমাত্র সুশিক্ষাই পারে একটি জাতির উন্নয়নের ধারাবাহিক সোপানকে ক্রমশ তরান্বিত করতে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে আমাদের দেশে এই বাস্তবতা আরও বেশি প্রযোজ্য। বিভিন্ন উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রের বাজেট পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে, কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে শিক্ষা খাতকে তারা বিশেষ দৃষ্টিতে রেখেছে এবং বাজেটে উত্তরোত্তর তার প্রতিফলন ঘটেছে। যার সুফলও সেসব দেশে পেয়েছে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বেশি অর্থ বরাদ্দ করত: প্রাথমিক শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর প্রাথমিক শিক্ষা। মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করা এ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। তবুও এখনও অনেক স্কুল বেসরকারি খাতে রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারকে এক বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। অবশ্য, উন্নত এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এ ব্যয় যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থায়নের উৎস

- **সরকারি অর্থ বরাদ্দ:** সরকারি অর্থ বরাদ্দই প্রাথমিক শিক্ষা অর্থায়নের প্রধান উৎস। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের যাবতীয় ব্যয় সরকারি অর্থে মেটানো হয়। এ ছাড়া রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল, স্যাটেলাইট স্কুল, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রভৃতির শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও সরকারি অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা হয়।
- **স্থানীয় সাহায্য:** স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তি, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের দান, স্থানীয় ভাবে চাঁদা আদায় ইত্যাদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে ধরা হয়। প্রাথমিক ভাবে স্কুল স্থাপন করার সময় এই উৎসের অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে অবস্থিত বিদ্যালয়সমূহের জন্যও এ ধরনের অর্থায়ন ও সহযোগিতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।
- **অপ্রকাশিত উৎস:** পিতা-মাতা কর্তৃক শিশুদের পোশাক পরিচ্ছদ ও কাগজ কলমের জন্য খরচ ইত্যাদি অপ্রকাশিত উৎস হিসেবে গণ্য করা যায়।
- **টিউশন ফি:** বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছাত্র বেতন আদায়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ।
- **বিদেশি সাহায্য:** আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অর্থ সাহায্য যা সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, একটি উল্লেখখযোগ্য অর্থায়নের উৎস।

অর্থ বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া

প্রাথমিক শিক্ষা অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ধাপগুলো লক্ষ্য করা যায়:

ক. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা অর্থায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন করে।
খ. এই বাজেট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রষালয়ে প্রেরণ করা হয়।
গ. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রষালয় এই বাজেট পর্যালোচনা করে দেখার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠায়।
ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে পেশ করে থাকে।
ঙ. জাতীয় সংসদ কর্তৃক বাজেট পাশ হওয়ার পর PMED সরকারি আদেশ (GO) জারি করত: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (TEO)-কে স্থানীয় ট্রেজারী থেকে অর্থ উত্তোলন ও শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।

অর্থ বরাদ্দ

জাতীয় রাজস্ব বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৮৩.৩২ কোটি টাকা। এই পরিমাণ শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের ৫১%। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরের মূল বাজেটে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১০২৮.৮৬ কোটি টাকা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা একত্রে)। সরকারি অর্থ বরাদ্দ থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ব্যয় ভার এবং রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রারম্ভিক মূল বেতনের ৫০% মেটানো হয়।

জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন খাতে এই বরাদ্দ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করে ৬,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষাখাতে অর্থায়ন

স্বাধীন বাংলাদেমের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৯৭৩-১৯৮০ সময়কালে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা খাতে গড়ে মোট জাতীয় আয়ের (GNP) ০.৯% ব্যয় করেছে। এখন এ বরাদ্দ ২.৪% শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকগুলো বছর ধরে শিক্ষা বাজেট সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে। জনপ্রশাসনের পরেই শিক্ষা খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে। জনপ্রশাসনে বরাদ্দ ১২.৬% ও শিক্ষা খাতে ১১.১৬% (বাজেট ২০১২-১৩)। কিন্তু জিডিপি এর শতাংশ হিসেবে জাতীয় বাজেটের সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধি সত্ত্বেও জিডিপি এর শতাংশ ও মোট বাজেটের হিসেবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের অংশ হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা বাজেটে জিডিপি এর অনুপাত ২%-এর আশেপাশে থেকেছে। মোট বাজেটের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি হয়েছে ২৮.৭% আর শিক্ষা বাজেটের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ২১.১%। শিক্ষা খাতে অনুন্নয়ন বাজেটের অংশ বরাবরই বেশি ছিল, প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং এ অংশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। প্রভিশনাল বাজেটে (অর্থ বছর-২০১২-১৩) শিশু পিছু বরাদ্দ ছিল ৩৪১৮ টাকা যা ২০০৯-১০ অর্থ বছরের তুলনায় বার্ষিক ১০.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু বার্ষিক বৃদ্ধি ২৭.৪%। অথাৎ জাতীয় বাজেটের মাথাপিছু বার্ষিক গড় বৃদ্ধি (২৭.৪%) শিক্ষা বাজেটের শিশু পিছু বার্ষিক গড় বৃদ্ধি (১০.৭%) অপেক্ষা অনেক বেশি। এর অর্থ হ'ল জিডিপির যে শতাংশ হারে প্রতি বছর জাতীয় বাজেট বাড়ছে সে অনুপাতে শিশু পিছু শিক্ষা বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের মধ্যে একটা ঐক্য মত্য লক্ষ্য করা যায় যে, ১৬ কোটি মানুষকে যদি একটি উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হয় তাহলে বর্তমান শিক্ষা-বিনিয়োগের পরিমাণকে (২.৪%) বাড়িয়ে

মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ৫-৭% শতাংশে উন্নীত করতে হবে (প্রাথমিক শিক্ষা কৌশলপত্র রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-২০১৩)।

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের কার্যক্রম মোটাদাগে দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুল লক্ষ্য। অন্যদিকে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাধান্য হচ্ছে- সাধারণ, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিক সম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি। উল্লেখ্য যে, এই দুই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের ধারা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ত্বরান্বিত হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাখাতে অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৩,১৩৪ কোটি টাকা এ খাতের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩১,৬০৫ কোটি টাকা যা ছিল মোট বাজেটের ১০.৭১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হল ৫৩,১৩৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৫.৬ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় এটি প্রায় ৬৮.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি উন্নয়নের জন্য একটি আদর্শ সহায়ক হতে পারে।

এডিপির বরাদ্দের পর্যালোচনা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শিক্ষাখাতে প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ হল ১৩,৮৭৭ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ এর সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ৪৬.০২ শতাংশ বেশি। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ এডিপির পরিমাণ ২০১৫-১৬ (প্রস্তাবিত) পর্যন্ত ক্রমশ হ্রাসমান হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপির বরাদ্দের পরিমাণ সংখ্যাগত ও শতাংশের হিসেবে পূর্বের অর্থবছরগুলোর তুলনায় বেশি। শিক্ষাখাতে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১১০টি (বিনিয়োগ, কারিগরী ও নিজস্ব অর্থায়ন সমন্বয়ে), যেখানে বিশেষত ঐ অর্থ বছরে নতুনভাবে সংযুক্ত প্রকল্প ছিল ৫টি। অন্যদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই খাতে মোট উন্নয়ন প্রকল্প রাখা হয়েছে ৯৬টি যার ভিতর ৯০টি বিনিয়োগ, ৫টি কারিগরী ও ১টি নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্ন হবে। এই অর্থবছরে নতুন সংযুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা তিনটি। এগুলো হলে শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সয়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থায়নের প্রধান উৎস কোনটি?
ক. ছাত্র বেতন
খ. বৈদেশিক সাহায্য
গ. সরকারি অর্থ বরাদ্দ
ঘ. স্থানীয় সাহায্যে

২. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা কত?
ক. ৯০ টি
খ. ৯২ টি
গ. ৯৪ টি
ঘ. ৯৬ টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার অর্থায়নের উৎসসমূহ বর্ণনা করুন।
২. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৩. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শিক্ষা বাজেট বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ২.৭: প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশিক্ষণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর ধারণা দিতে পারবেন এবং পদ্ধতি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,
বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রশিক্ষণ কী এবং প্রশিক্ষণ কত প্রকার সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। পেশাগত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পালনের জন্য যে ব্যবস্থা, বাস্তব প্রস্তুতি ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষভাবে যে কর্ম তৎপরতা তাই প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ বিশেষভাবে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাস্তবধর্মী কাজে প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনকে প্রশিক্ষণ বলে। প্রশিক্ষণ বলতে অংশগ্রহণকারীর কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুসঙ্গত কার্যক্রমকে বুঝায়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এক কথায় ইংরেজি ASK দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এর বিশ্লেষণে A দিয়ে Attitude অর্থাৎ আচরণ, S দিয়ে Skill অর্থাৎ দক্ষতা এবং K দিয়ে Knowledge অর্থাৎ জ্ঞান বুঝানো হয়।

প্রশিক্ষণ অবশ্যই কর্মকেন্দ্রিক হবে। অটো ও গ্রেসারের মতে, "প্রশিক্ষণ বলতে এমন কিছু শিক্ষণ কার্যক্রমকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোন সংস্থার সদস্যগণ সংস্থার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, পারদর্শিতা এবং আচরণ আহরণ ও প্রয়োগ কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম"। বীচের মতে, "প্রশিক্ষণ হল একটি সংগঠিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াই হল প্রশিক্ষণ। সকল পেশাতেই প্রশিক্ষণ জরুরী কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যত সুনাগরিক তৈরীর জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ অতি জরুরী। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠদান সম্ভব। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব। একটি প্রবাদ আছে– "I hear I forget, I see I remember, and I do I understand". এখানে "do" হল প্রশিক্ষণ। সুতরাং ব্যক্তির পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের পরিবর্তনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সাধারণ অর্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায় পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের যে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিসরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মেধা, প্রবণতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে সঠিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলা হয় যে প্রক্রিয়ায় তাকেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Teacher Training) বলা হয়। জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের মান সম্মত পাঠদান নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত উৎকর্ষ সাধন শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা যে একটি পেশা এবং অন্যান্য পেশার মত এর জন্যও যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এ

সত্যটি এখন সবজর্ন স্বীকৃত। শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, গণিতজ্ঞ-আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Aims of Education'-এ লিখেছেন, "The nation that does not value trained intelligence to be doomed". অর্থাৎ যে জাতি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বুদ্ধিমত্তার মূল্য দেয় না সে জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ

প্রশিক্ষণের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. চাকুরি প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ (Pre-service Training)
২. চাকুরি কালীন প্রশিক্ষণ (In-service Training)

চাকুরি প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ

শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের পূর্বে শিক্ষাদানের কলাকৌশলসমূহ আয়ত্তকরণের নিমিত্তে যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয় তাই চাকুরি প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ। শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল"।

শিক্ষকতা একটি পেশা এবং অন্যান্য পেশার মত এর জন্যেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য যদি যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সকল প্রচেষ্টা এবং এব্যাপারে নিয়োজিত সকল সম্পদ যেমন– শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ সবই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। জাপানে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই চাকুরির পূর্ব প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ করা হয়না। অর্থাৎ শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব শর্ত হল চাকুরি পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ। কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ শিক্ষকদেরকে যে পেশাগত দক্ষতা দান করে তা পরীক্ষিত হয় বাস্তবে শ্রেণিকক্ষে। কাজেই পেশাগত জীবনে উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারিক পাঠদানের উপর। আমাদের দেশে সাধারণত পি.টি.আই, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্বদ্যিালয়ের আইইআর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিসহ অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সি-ইন-এড, বিএড, বিএড অনার্স ইত্যাদি ডিগ্রি হচ্ছে চাকুরি পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ।

কর্মকালীন/চাকুরি কালীন প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের শিক্ষকতা চলাকালীন সময় শিক্ষাদান কার্যে আরও বুৎপত্তি লাভের জন্য যে প্রশিক্ষণ প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত আছে তাকেই চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বলা হয়।

কর্মকালীন/চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা

In Service Training includes all training activities, which address the differentiated needs of teachers in school (including teachers without pre-service training) to improve their knowledge, skills and attitudes for better instruction.

শিক্ষকগণ যাতে দক্ষতার সাথে যুগের দাবী অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্য সূচারুরূপে পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য তাদের চাকুরিকালীন পেশাগত উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকগণ যদি পরিবর্তন ও প্রগতিশীল জগতের শিক্ষার উদ্দেশ্য, গতি-প্রকৃতি, শিক্ষাদান কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল না হন তাহলে

গতিশীল, সৃজনশীল ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্থক জীবন গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ প্রচুর নির্মাণ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরের অভাবে যেমন সুন্দর ও মজবুত অট্টালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, তেমনি যোগ্য শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা লাভ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়।

চাকুরি প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ যেমন শিক্ষককে শিক্ষাদানের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করে যথাযথ পাঠদানে সক্ষম করে তোলে, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ তেমনি শিক্ষককে নবতর জ্ঞানের ক্ষেত্র, ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষাদানের নতুন নতুন পদ্ধতির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে নতুনভাবে পাঠদানে উজ্জীবীত ও সঞ্জীবিত করে তোলে। তাই চাকুরি প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চাকুরি কালীন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চাকুরি কালীন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সামছুল কবীর বলেন, "এক জন সফল শিক্ষককে অবশ্যই নতুনতর জ্ঞান ও কুশলতার সঙ্গে পরিচিতি থাকতে হয়। এজন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বল্পকালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ তার জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষাবিদ মার্গারেট রিড্ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মরত শিক্ষকদের নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আধুনিকী করার পর্যাপ্ত সুযোগ করে দেয়"। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন,

"Teachers who never heard a radio until they were grown up to cope with the children who have never known a world without a television".

এ কারণে শিক্ষকদের অনবরতই থাকতে হবে দুনিয়ার চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর ভাষায়, "To keep abreast of a changing world".

UNESCO, APEID রিপোর্টে উল্লেখ করেছে,

"No Teacher comes out of the teachers training institutions as a full fledged teacher. Hence there will always be need for in service education programs for teachers and other school personnel".

আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন কর্মকালীন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "কর্মকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় প্রধানত দুটি কারণে।

ক. সময়ের সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়, শিক্ষকের চাকুরি পূর্বকালের প্রস্তুতি আর তখন যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না।
খ. সময়ের পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও চাহিদা বদলে যায়। শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন ঘটে। তখন শিক্ষকদের তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়।

এসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের স্বার্থে সব শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নানা ধরনের ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উন্নত দেশসমূহেও আজকাল যেসব নিত্য নতুন শিক্ষনীতি ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে সেসব দেশ তাদের শিক্ষা প্রশাসন এবং সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য নিজ নিজ বিষয়াদিতে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স, রিফ্রেসার কোর্স, গ্রীষ্মকালীন কোর্স, সম্প্রসারণ কোর্স, গবেষণা সভা, পেশাগত আলোচনা সভা ও শিক্ষা কর্মশালা প্রভৃতি পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া নানা রূপ প্রকাশনা যেমন– সাময়িক পত্র-পত্রিকা, ম্যাগজিন, গবেষণামূলক পুস্তিকা প্রভৃতি তাদের শিক্ষক সমাজে নতুন নতুন জ্ঞান ও ভাবধারা সঞ্চারে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের পটভূমি

বৃটিশ যুগ

আধুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মূল সূত্রের অস্তিত্ব ভারতেই বিদ্যমান ছিল। দেশজ শিক্ষাস্তরে 'সর্দার পড়ো' পদ্ধতির মধ্যেই ছিল পরবর্তী শিক্ষকদের শিক্ষা। ড. এন্ড্রুবেল (Dr. Andrew Bell) মাদ্রাজে কর্মরত অবস্থায় এই পদ্ধতির সন্ধান পান এবং এটিকে ইংল্যান্ডে মনিটরিয়াল সিস্টেম হিসেবে প্রবর্তন করেন।

ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৯) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮২৬ সালে টমাস মুনরোর পরামর্শে কলকাতায় শিক্ষক শিক্ষণের জন্যে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতায় একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সরকারী প্রচেষ্টা ক্রমশ তৎপর হতে থাকে। ১৮৫৪ সালে তৎকালীন ভারতবর্ষে উড এর ডেসপ্যাচ নামে খ্যাত সরকারী শিক্ষানীতি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে উল্লেখ আছে যে, ইংল্যান্ডে যখন দক্ষ স্কুল শিক্ষকের অভাব অনুভূত হয় তখন প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের নিমিত্তে নরমাল ও মডেল স্কুল স্থাপন করা হয়।

উড প্রত্যক্ষ করেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশেও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ও দক্ষ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এখানকার শিক্ষকদের জন্য ইংল্যান্ডের মত ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলেও তিনি ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে প্রশিক্ষণ কালীন ভাতা প্রদান ও প্রশিক্ষণ শেষে স্কুল মাস্টার হিসেবে নিয়োগের জন্য তিনি সুপারিশ করেন।

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত উডের দলিল শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যায়ে শিক্ষা উদ্যোগকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। ১৮৫৫ সালে তৎকালীন দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয় পরিদর্শক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ছ'মাস অন্তর ষাটজন করে প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এই বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়। ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় হুগলী নর্মাল স্কুল (চুঁচুড়া)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন এখানকার প্রধান শিক্ষক। এছাড়া ঢাকা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে।

১৮৫৯ সালে স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে বাংলাদেশের মোট ৪টি নর্মাল স্কুল এবং ২৫৮ জন শিক্ষার্থীর বিবরণ পাওয়া যায়। হান্টার কমিশনের সুপারিশ (১৮৮২) শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। এ সুপারিশক্রমে ১৮৮২ সালের মধ্যে ১৫টি নরমাল স্কুল শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল। মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য এই ট্রেনিং বিদ্যালয়গুলো ব্যবহৃত হত। এরপর থেকে বঙ্গ দেশের নর্মাল স্কুলের সংখ্যা ছাব্বিশটির মত ছিল। উল্লেখ করা যায় যে, এই শতাব্দীতে বঙ্গ দেশের এই সব নর্মাল স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে শিক্ষকরা যেসব বিষয় পড়াতেন সেই বিষয়গুলো ভাল করে শিখে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হত।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত হল হান্টার কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশ থেকে। কমিশনের সুপারিশ ছিল, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদানের ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষণের প্রস্তাব। এছাড়া কমিশন গ্রাজুয়েট এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটদের পৃথক শিক্ষণের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ বছরে ৬টি ট্রেনিং কলেজ (মাদ্রাজ, লাহোর, রাজমুন্ডি, জব্বলপুর, এলাহাবাদ এবং কার্সিয়াং) ৫০টি ট্রেনিং স্কুল গড়ে ওঠে। এগুলো ছিল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রাথমিক

শিক্ষকদের ট্রেনিং এর জন্য ১৩৩টি এবং শিক্ষিকাদের জন্য ৪৬টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। নর্মাল স্কুলগুলোতে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকদের আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪, ৪১০ এবং ১, ২৯২টি।

প্রক্ষান্তরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই গড়ে ওঠে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান; তাহল গ্রেডেড ট্রেনিং স্কুল, গুরু ট্রেনিং স্কুল এবং মহিলা ট্রেনিং স্কুল। পরবর্তীতে এগুলো জুনিয়র ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯০১ সাল থেকে দুই ধরনের গ্রেডেড ট্রেনিং স্কুল প্রচলিত ছিল। যথা: ফাস্ট গ্রেড ট্রেনিং স্কুল এবং সেকেন্ড গ্রেড ট্রেনিং স্কুল। ফাস্ট গ্রেড ট্রেনিং স্কুল ১৯০১ সালে চালু হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ছিল দুই বছর। এক বছর পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সেকেন্ড গ্রেড ভার্নাকুলার মাস্টারশীপ সার্টিফিকেট দেয়া হত। দ্বিতীয় বছর শেষে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করলে চূড়ান্ত ফাইনাল ভার্নাকুলার মাস্টার সার্টিফিকেট দেয়া হত। ১৯০৯ সালে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি এই কোর্স পূনর্গঠনের সুপারিশ করেন। সুপারিশক্রমে ১৯১১ সাল থেকে নতুন স্কীম চালু হয়। সেই সময় শিক্ষাকতায় স্নাতক কোর্স চালু হয়।

মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল

নারী শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের দাবী উপস্থিত করেছিলেন মেরী কার্পেন্টার নামে একজন ইংরেজ মহিলা। ১৮৬৬ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং তখন থেকে নানা পরিকল্পনার সাহায্যে নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, উপযুক্ত নারী শিক্ষিকা প্রস্তুত করতে না পারলে ভারতে নারী শিক্ষার উন্নতি হবেনা। মহিলা শিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা তার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তৎকালীন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক মি. উড্রো কর্তৃক গৃহীত হয়। মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুসারে মিসেস বিট্রস্ বেথুন বিদ্যালয় ও নরমাল স্কুলের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন এবং বেথুন বিদ্যালয়কে পুরোপুরি সরকারী কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা হয় (জানুয়ারী ১৮৬৯)। ১৮৭০ সালে পুনা শহরেও একটি মহিলা শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ৮টি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। এর মধ্যে ১টি বর্ধমানে ৩টি প্রেসিডেন্সিতে ও ৪টি এলিমেন্টারী ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে এগুলোর পরিচালনা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে মহিলা শিক্ষিকা বাড়ানোর জন্য বিকল্প পদক্ষেপ নেয়া হয়। তার মধ্যে একটি ছিল যেসব গুরুদের নিজস্ব স্কুল ছিল তাদের স্ত্রীদের পড়ানোর জন্য গুরুদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের স্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থপন করবেন। কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে কলকাতা মহিলা ট্রেনিং স্কুল এবং বাকিপুরে বাদশা নওয়াব রেজভি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা শিক্ষিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণের মান ধীরে ধীরে উন্নত হতে লাগল।

গুরু ট্রেনিং স্কুল

১৯০১ সালে সিমলা কনফারেন্সের সুপারিশক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্কুল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম গুরুট্রেনিং (জিটি) প্রবর্তন করা হয়। এই স্কুলে দুইজন মেট্রিক ভি.এম (ভার্নাকুলার মাস্টারশীপ) গুরুপাশ শিক্ষক কাজ করতেন। তাদের একজন ছিলেন হেড পণ্ডিত, অপর জন সহকারী পণ্ডিত। প্রতিটি জিটি স্কুলে প্রথমে ১০ ও পরে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হত।

জিটি স্কুলগুলোতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় এসব বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার গভীরতা কম ছিল। অন্যদিকে এগুলোতে ব্যবহারিক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হত। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে বিভন্ন বিষয় শিক্ষাদানের উপযোগী ছবি, মডেল, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি তৈরি করতে হত।

১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা প্রস্তাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়-

১. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য ব্যক্তিরাই হবেন ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের সদস্য।
২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজ সাধারণ স্নাতক কলেজের মর্যাদা লাভ করবে।
৩. স্নাতকদের জন্য থাকবে এক বছরের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স এবং অস্নাতকদের জন্য হবে দু'বছরের কোর্স। এদের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ট্রেনিং কোর্সের যোগসূত্র স্থাপিত হবে।
৪. শিক্ষাতত্ত্ব ও ব্যবহারিক টিচিং শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হবে।
৫. ট্রেনিং কলেজ এবং প্রাকটিস-টিচিং স্কুলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

এই প্রস্তাবের ফলশ্রুতি স্বরূপ শিক্ষক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নতুন কতগুলো কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজগুলো হল– বোম্বাই এর এস.টি. কলেজ (১৯০৬), কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ (১৯০৮), পাটনা ট্রেনিং কলেজ (১৯০৮), ঢাকা ট্রেনিং কলেজ (১৯০৯), জব্বলপুর ট্রেনিং কলেজ (১৯১১)। ১৯১৩ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা প্রস্তাবে পুনরায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রশিক্ষণ বিহীন কোন শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে শিক্ষকতা কর্মে গ্রহণ করা হবেনা।

এরপর স্যাডলার কমিশন বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন 'শিক্ষা বিভাগ' খোলা এবং এই ব্যাপারে গবেষণার সূযোগ সৃষ্টির সুপারিশ করেন। তারপর হার্টোগ কমিটি (১৯২৯) প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চতর মানের প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার কোর্স, মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। এরপর সার্জেন্ট প্রকল্পে (১৯৪৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। এসব সুপারিশকে কার্যকর করার পূর্বেই ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে (১৯৪৭)।

বৃটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান প্রশাসনের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মন্থর গতিতে বিস্তার লাভ করার ফলে এদেশীয় গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই আশানুরূপভাবে সম্প্রসারিত হতে পারেনি। একারণেই স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটি নিজ নিজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো সুষ্ঠুভাবে গঠন ও সম্প্রসারণ করতে প্রচেষ্টা চালান।

১৯৪৪ সালে ৪৫-৫৫ টি জিটি স্কুলকে প্রাইমারী ট্রেনিং (পিটি) স্কুলে রূপান্তরের মাধ্যমে এই ভু-খন্ডে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আধুনিকায়ন শুরু হয়। নতুন প্রাইমারী ট্রেনিং (পিটি) সেন্টার খোলা হয়। পিটি স্কুলও পিটি সেন্টারের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি জিটি স্কুলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অনুরূপ ছিল। তবে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য ছিল। পিটি স্কুলগুলোতে বিটি ডিগ্রীসহ একজন গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষক ইনচার্জ থাকতেন। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন অবসানের মূহুর্তে বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পুর্ববঙ্গে পিটি স্কুলও পিটি সেন্টারের সংখ্যা ছিল মোট ৮৬টি।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৪৮ সালে ময়মনসিংহ শহরে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রবর্তিত ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন এবং হায়ার ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন নামক কোর্স দুটির প্রত্যিকটি এক বছর মেয়াদী ছিল।

পিটি স্কুল ও পিটি সেন্টারগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের চাহিদা পূরণের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটি ১৯৪৯ এর সুপারিশ অনুযায়ী এসব স্কুল উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই) স্থাপন করে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন নামে এক বছর মেয়াদী একটি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে পিটিআই এর সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে ২টি বেসরকারীসহ মোট পিটিআই এর সংখ্যা ৫৫টি।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৪৭টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট ছিল। বর্তমানে এর কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটগুলোতে প্রবর্তিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্স শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ও ময়মনসিংহ মহিলা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বিভাগে পরিচালিত হতো। কমপক্ষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষা পাশ শিক্ষর্থীদের এই কোর্সের জন্য ভর্তি করা হত এবং তাদের মেধানুসারে মাসিক ৩০ টাকা ও ৫০ টাকা করে যথাক্রমে স্টাইপেন্ড ও স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় নামে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লোমা ও হায়ার ডিপ্লোমা কোর্স দুটি যথাক্রমে বিএড ও এমএ-ইন-এডুকেশন নাম ধারণ করে। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটগুলোর প্রতিষ্ঠার সময়কাল নিচের ছকে উল্লেখ করা হলঃ

সারণীঃ ১.৪ বাংলাদেশের পিটিআইসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী সংখ্যা–

বছর	সংখ্যা	মোট ক্রমযোজিত সংখ্যা
১৯৩১-১৯৪০	১	১
১৯৪১-১৯৫০	০	১
১৯৫১-১৯৬০	২৬	২৭
১৯৬১-১৯৭০	২০	৪৭
১৯৭১-১৯৯৭	৭	৫৪
১৯৯৮-২০০৩	১	৫৫
২০০৪	০৯	৫৫
সর্বমোট =		**৬টি**

উক্ত ৫৫টি পিটিআই এর মধ্যে ৬৪টি সরকারী ২টি মাত্র বেসরকারী। দেশের প্রথম বেসরকারী পিটিআই হল বিরিশির বেসরকারী পিটিআই। এটি ১৯৩১ সালে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার বিরিশির নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সৃষ্টির পর থেকে পিটিআইগুলোর প্রধান কার্যক্রম হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এক বছর ব্যাপী সি.ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান। এই প্রশিক্ষণ চাকুরিপূর্ব হলেও লক্ষ্যণীয় ছিল যে, বিপুল সংখ্যক কর্মরত শিক্ষক এই কোর্সে ভর্তি হত। দেশের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করে পিটিআইসমূহের সিইনএড কোর্স পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমদিকে এই কোর্সে ভর্তির জন্য নূন্যতম যোগ্যতা ছিল প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। পরবর্তীতে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই যোগ্যতা এইচএসসি নির্ধারিত হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, এসএসসি অথবা এইচএসসি যেকোন একটিতে ন্যূন্যতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতা শিথিল করা হয় এবং তাদের ন্যূন্যতম যোগ্যতা ধরা হয় দ্বিতীয় শ্রেণির এসএসসি পাশ।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণেও এই পরিবর্তনের ছাপ গভীরভাবে অংকিত হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ৫৩টি সরকারী এবং ২টি বেসরকারী (২০০১)

প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট রয়েছে। ইন্‌স্টিটিউট গুলোতে এক বছর মেয়াদী 'সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন' কোর্সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানরত অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন এমন সব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটের বর্তমান শিক্ষাক্রমে পেশাগত এবং সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ বিষয়গুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়াদির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পড়ানো হয়ে থাকে। পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

পিটিআই এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়ন এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথ সুগম করতে ১৯৭৮ সালে ময়মসিংহে জাতীয় মৌলিক শিক্ষা একাডেমী স্থাপিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্য এই একাডেমী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে থাকে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শেষ পরীক্ষা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত হয়।

পিটিআই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় ২৫ বছর সেখানে একই পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে প্রথমবারের মত এই পাঠ্যক্রমের পুনঃসংস্করণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক চারটি নির্বাচিত পিটিআই এ প্রধান শিক্ষদের উচ্চ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ (Higher C-in-Ed.) দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পরিকল্পনা ছিল। এ প্রেক্ষিতে চাকুরিপূর্ব ও চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। উন্নত ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষোপকরণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রতিবছর উপজেলা পর্যায়ে সীমিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের চাকুরি প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণের জন্য ৫৫টি পিটিআই সিইনএড কার্যক্রম পরিচালনা করে। পিটিআইতে ১৯৭৯ সাল থেকে এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-ইডুকেশন বা সি.ইন.এড. কোর্সটি চালু করা হয়েছিল। সি.ইন.এড কোর্সটি পরবর্তীকালে ১৯৯২ এবং ২০০১ সালে পরিমার্জিত হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটিকে পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১২ সালে ডিপিএড কোর্স ৭টি পিটিআইতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। ডিপিএড এর ৭টি কোর্সের ১০টি তথ্যপুস্তক ও ১০টি ইন্সট্রাক্টর নির্দেশিকা ছাড়াও শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পিটিআই শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য ৩টি নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি বই প্রণয়ন করা হয়। ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। সরকার ডিপিএড কোর্সের চাহিদা মোতাবেক জনবল ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে পিটিআইসমূহে পর্যায়ক্রমে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরও ২২টি পিটিআইতে এবং ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস হতে ৩৬টি পিটিআইতে তা সম্প্রসারিত হয়। ২০১৭ সালে সকল পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই কোর্সটির ধ্যান ধারণাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা পুস্তকগুলোতে সময় সময় পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০১৪ সালে পুস্তকগুলোতে মুদ্রণ ভ্রান্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। বর্তমান আর্থিক বছরে একই কারণে কোর্স সামগ্রী

এবং নির্দেশিকা বইগুলোতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন এবং, উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা বাস্তব ও মানসম্পন্ন করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রীক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সিইনএড প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আশির দশকে ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সে দক্ষতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উপরই প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

তাই শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষা বিজ্ঞানের নবতর ধ্যান-ধারণা লাভ করতে পারেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ অধিকতর দক্ষতার সাথে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক চাকুরিকালীন পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ফল স্বরূপ ক্লাস্টার ট্রেনিং পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ক্লাস্টার ট্রেনিং

ক্লাস্টার ট্রেনিং হল 'ক্লাস্টার পর্যায়ে স্কুল ভিত্তিক চাকুরিকালীন পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সংক্ষেপে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে 'ক্লাস্টার ট্রেনিং' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ক্লাস্টার ট্রেনিং একটি নতুন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। বিশটি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠিত হয়।

ক্লাস্টার ট্রেনিং সম্পর্কে ড. সিদ্দিকুর রহমান তার 'A Study on Recurrent Cluster Training Programme' এ বলেছেন–

An introduction Cluster Training is a short, recurrent on the job school based training program. It is a face-to-face contact session conducted in the respective school setting of the teachers. Each training session deals with a single topic. In presenting the topic participatory approach is followed. It is held once a month and at least eight times a year in the situation where the trainees encounter the problem. Each session continues for two to three hours. Training is followed by school Supervision by the AUEO in charge of the cluster at least once month. The main aim of the training is to enrich the quality of primary education through improvement of the knowledge base, professional skills and attitude of teachers.

১৯৮৩ সালে পরীক্ষমূলকভাবে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সরাইল এবং গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় ক্লাস্টার ট্রেনিং শুরু করা হয়। পরীক্ষামূলক মূল্যায়নের ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (আই.ডি.এ) প্রকল্পের সমগ্র এলাকায় বিদ্যালয় ক্লাস্টার ভিত্তিক ট্রেনিং চালু করা হয়।

প্রতিটি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে কয়েকটি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়। বিশটি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠন করা হয়। প্রতিটি ক্লাস্টারের জন্য নিয়োগ করা হয় একজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার। ক্লাস্টারের বিদ্যালয় গুলোর শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিত করা ও তার সমাধান করা এবং শিক্ষকদের পাঠদানের মানোন্নয়ন করাই ছিল ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সমীক্ষা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয় ভিত্তিক ক্লাস্টার প্রশিক্ষণকে স্থানীয় চাহিদার আলোকে সাব-ক্লাস্টারে রূপান্তরিত করা হয়।

সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং

সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং হল ক্লাস্টার ট্রেনিং এর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর রূপ। ৪/৫টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি সাব-ক্লাস্টার গঠিত হয়। ২৫/৩০ জন শিক্ষক নিয়ে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ক) বিষয় ভিত্তিক প্রদর্শনী পাঠ ও প্রদর্শনী পাঠ পর্যালোচনা (খ) লিফলেট ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (গ) সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম (ঘ) মুক্ত আলোচনা-এ কয়টি পর্বে বিভক্ত। সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকেন।

সারাদেশে ৬টি বিভাগে ৯৬৭৫টি সাব-ক্লাস্টার পরিচালিত হয়ে আসছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়ে ১০১৯১-এ দাঁড়িয়েছে। সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কার্যকর করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, শিক্ষকদের সহায়তায় ৫৮টি লিফলেট উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তীতে আরও ২৬টি লিফলেট উন্নয়ন করা হয়।

সাব-ক্লাস্টারের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় দলে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের একত্রিত করা এবং তাদের মধ্যে মত বিনিময় ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সমস্যা এবং সমাধানের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করা।
- লিফলেট ভিত্তিক ট্রেনিং ছাড়া সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, প্রদর্শনী পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের পারদর্শী করা।
- প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে পূর্ণ দিবস ব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- এস.এম.সি/পিটিএ চেয়ারম্যানদের উপস্থিতিতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সাথে সমাজের সম্পর্ক গড়ে তোলা।

সাব-ক্লাস্টারের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

- ৪/৫টি বিদ্যলয়ের শিক্ষকগণ সাব-ক্লাস্টারের একটি বিদ্যালয়ে (পর্যায়ক্রমে) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সমবেত হবেন।
- অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সংখ্যা হবে ১৫ থেকে ২০ জন।
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রতি ২ মাসে একবার (প্রশিক্ষণ পূর্ণ দিবসব্যাপী সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এবং বছরে ৬ বার) অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রশিক্ষণের স্থান পর্যায়ক্রমে সব স্কুলে নির্ধারণ করা হয়। যদি কোন স্কুলের দূরত্ব এমন হয় (৫/৬ মাইল) যে শিক্ষিকাদের যেতে অসুবিধা হবে তাহলে সাব-ক্লাস্টার ভেঙ্গে ছোট করা যাবে। সাব-ক্লাস্টার কেন্দ্র থেকে স্কুলের দূরত্ব তিন কিলোমিটারের বেশি হবে না।
- একটি ক্লাস্টার ভেঙ্গে ৪/৫টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি সাব-ক্লাস্টার গঠন করতে হবে। সাব-ক্লাস্টারের সংখ্যা নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করে যে মাসের প্রোগ্রাম তার আগের মাসে তৈরি করে সংশ্লিষ্ট এ.ইউ.ই.ও সংশ্লিষ্ট ইউ.ই.ও-এর অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ডি.পি.ই.ও এবং প্রধান শিক্ষক বরাবরে প্রোগ্রাম পাঠাতে হয়।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের (ইউআরসি) কার্যক্রম

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোতে একটি নবতর সংযোজন এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা শিক্ষকসহ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সকলের সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিভিন্ন কমিটির কর্মকর্তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরাসরি প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন প্রদান, সেমিনার আয়োজন, কারিগরি সমর্থন প্রদান, তথ্য সরবরাহ, গ্রন্থাগার/ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্যই এই রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার বা ইউআরসি'র মূল দায়িত্ব হচ্ছে স্থানীয়ভাবে অথবা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/নেপ পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন/সেমিনারের আয়োজনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর কাজগুলোর মধ্যে নিচে প্রদত্ত কাজগুলো উল্লেখযোগ্য:

১. তাৎক্ষণিক চাহিদার ভিত্তিতে বা চাহিদা যাচাইয়ের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
২. বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকদের চাহিদা যাচাই ও প্রশিক্ষণের ফলাফল/প্রভাব প্রত্যক্ষণ করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।
৩. এসএমসি-কে শক্তিশালী ও দক্ষ করার জন্য ওরিয়েন্টশন আয়োজন।
৪. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক প্রোফাইলসহ বিদ্যালয়ের মান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা।
৫. ইউআরসি প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত বইপত্র, পিরিওডিক্যালস, ম্যাগাজিন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া। স্থানীয়ভাবে অবহিতকরণের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিউজ লেটার/তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করা ।
৬. পাঠ সংক্রান্ত শিক্ষা-উপকরণ তৈরি, সংরক্ষণ ও ক্লাসে এর ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "একজন সফল শিক্ষককে অবশ্যই নতুন জ্ঞান ও কুশলতার সঙ্গে পরিচিতি থাকতে হয়"–এ উক্তিটি কে করেন?
   ক. আবদুল্লাহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন
   খ. মার্গারেট রিড
   গ. সামছুল কবীর
   ঘ. হোসাইট হেড

২. ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সটি কত সালে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?
   ক. ২০১০ খ্রী:
   খ. ২০১১ খ্রী:
   গ. ২০১২ খ্রী:
   ঘ. ২০১৩ খ্রী:

৩. কতটি বিদ্যালয় নিয়ে একটি সাব-ক্লাস্টার গঠিত হয়?
   ক. ৩/৪ টি
   খ. ৪/৫ টি
   গ. ৫/৬ টি
   ঘ. ৬/৭ টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. খ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রশিক্ষণ কী? শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দিন।
৪. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর ধারণা দিন এবং এর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৫. ইউআরসির কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৮: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইস্যু ও চ্যালেঞ্জগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিরাজমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দক্ষ জনসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ইস্যুগুলো ও চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় এনে সেগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইস্যু ও চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১. প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বিদ্যমান পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছরে উন্নীত করার অঙ্গীকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে ব্যক্ত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হ'ল– (ক) অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণ ও (খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের সংস্থান। কিন্তু স্বল্প সময়ে এ দু'টি পদক্ষেপের বাস্তবায়ন রীতিমত দুরূহ। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঘোষণা সত্ত্বেও সরকার ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে ৬ষ্ট-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে পারেনি। তাই অনেকেই মনে করেন বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করলেও বিদ্যালয় এবং শিক্ষক আপাতত অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করে নিয়ন্ত্রণের ভার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষক স্বল্পতা ও অবকাঠামোগত সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

২. শিক্ষার গুণগত বিষয়:

প্রাতমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মান আজও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। এর জন্য দায়ী কারণগুলো নিম্নরূপ (৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা- ২০১৫/১৬- ২০১৯/২০, ২০১৬):

ক. **শিক্ষকদের সক্ষমতা:** যদিও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাত বেড়ে গেছে তবুও শিক্ষকদের একটি বড় অংশ এখনো প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে। উপরন্তু, শিক্ষকরা যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে তা কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অপর্যাপ্ত। যদিও মহিলা শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার এক ধাপ অগ্রগতি সাধন করে এসএসসি হতে উচ্চ মাধ্যমিক করা হয়েছে- এটাও পর্যাপ্ত নয়।

খ. **শিক্ষকদের অনুপস্থিতি এবং শ্লথগতি:** বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় ১৩-১৭ শতাংশ শিক্ষক অনুপস্থিত এবং শিক্ষকদের ৩০ শতাংশ শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি এবং শ্লথগতি শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত করে।

গ. **পাঠ্যক্রমের অনুপযোগিতা:** শিক্ষাদান মানের ঘাটতি ছাড়াও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রায়ই অনেক বিষয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো পদ্ধতির আধুনিককায়নের অভাব। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধে শিক্ষাক্রমে ঐক্য সাধনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এটি শুধুমাত্র মৌলিক বিষয়ের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে। শিক্ষার তিনটি ধারায় (বাংলা,

ইংরেজি এবং মাদ্রাসা) কোন সমন্বয় সাধন করা যায় নি, যা ভালো ফলাফল দিতে পারে, বরং তা প্রায়ই বিদ্যমান বৈষম্যকে জটিল করে তোলে।

ঘ. **ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার স্বল্পতা:** বিদ্যালয়ের স্বল্প ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থা, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষণসহ সার্বিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে বিপুলভাবে খর্ব করে। এগুলো উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশের জন্য সমতার অভীষ্ট মান অর্জনে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। বালিকাদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার সীমাবদ্ধতা বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে তাদের নিরুৎসাহিত করেছে। ন্যাশনাল হাইজিন বেজলাইন জরিপ- ২০১৪-তে দেখা গেছে যে, ১১ শতাংশ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য সাবান ও পানির প্রাপ্যতাসহ পৃথক টয়লেট ছিল এবং ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ের টয়লেটে স্যানিটারি বর্জ্য নিক্ষেপণের সুবিধা ছিল। এছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চিহ্নিত করেছে যে, ১৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। এই সব গ্রামে ২০০০ এর বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এবং ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন বিদ্যালয় নেই। সাধারণত এই এলাকাগুলোতে শিক্ষার সুযোগ সীমিত এবং এগুলো বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত যেমন: উপকূলীয়অঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায়।

৩. প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষা শিখন:

অনেকেই মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষাকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদোর মতে এ স্তরে বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজন নাই। আবার অনেকে প্রাথমিক স্তরের শুরু থেকেই ইংরেজি শেখানোর পক্ষে। আবার কেউ কেউ তৃতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি শেখানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আবার কেউ কেউ ইংরেজির পাপাশি নিজ ধর্ম-ভাষা (যেমন: আরবী/সংস্কৃত/পালি) শেখানের পক্ষে মত দেন।

৪. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ট্রেড শিক্ষা প্রবর্তন

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ট্রেড শিক্ষা চালু নেই। কোন কোন শিক্ষা কমিশনে প্রাথমিক স্তরে অন্তত একটি ট্রেড কোর্স চালুর পক্ষে মত দেয়া হয়েছে।

৫. একই ধারার শিক্ষা প্রবর্তন এবং বৈষম্য দূরীকরণ

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়ি ইত্যাদি ধারা চালু আছে। আমাদেও প্রাথমিক স্তরে একই ধারার শিক্ষা প্রবর্তন করা খুবই জরুরি। এ প্রসঙ্গে ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ওল্ডস্কিম, নিউস্কিম মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষার ধারা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "ইহা শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল গোন্ডগোলই সৃষ্টি করিয়াছে এবং মুসলমান সমাজে অনৈক্য আনয়ন করিয়াছে"। তিনি আরও বলেছেন,"পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে সরকার একাধিক শিক্ষা প্রণালী কখনও মঞ্জুর করেন না"। কিন্তু, আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারা-উপধারা, বিভিন্ন ব্যবস্থা, উপ-ব্যবস্থা, পদ্ধতিগত পার্থক্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অথচ একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। আশার কথা হল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন, প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদ্রাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর উপর গুরত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই শিক্ষা নীতিতে বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত হয়েছে।

৬. শিক্ষার সুযোগে সৃষ্টি ও ঝরে পড়া প্রতিরোধ

ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সকল স্তরের শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আজও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। দরিদ্রতা, অভিভাবকের অসচেতনতা, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক কারণে অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার সীমিত। দরিদ্র বস্তি পরিবারের শিশুদের শিক্ষার হার কম। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুনরাবৃত্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে কম তবুও এখনো এর হার উচ্চ।

বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থানের দুর্গমতার কারণে শিশুদের পক্ষে পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে, ছোট-বড় পাহাড়ী ছড়া-নদী পেরিয়ে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করা বিশেষতঃ বর্ষার মৌসুমে রীতিমত শ্রমসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। চরম দারিদ্যতাও শিক্ষার অভিগম্যতা লাভের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে আছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রাঙ্গামাটি জেলায়, এখনও এ জেলার ৬২ শতাংশ পরিবার চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। আর অতি দরিদ্রের সংখ্যা ৩৬ শতাংশ। স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবন-ব্যবস্থার সাথে সংগতিহীন শিক্ষাপঞ্জীর কারণেও বিদ্যালয়ে অভিগম্যতা ক্ষুন্ন হয়। জুমের মৌসুমে বিদ্যালয়ের পঞ্জীতে কোন ছুটির ব্যবস্থপনা না থাকায় এইসময়ে এসব পরিবারের অনেক শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারেনা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশিচত করার ক্ষেত্রে এসব বিষয় জরুরিভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়েজন। তাহলেই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করত: দেশের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

৭. লিঙ্গ বৈষম্য

দারিদ্র্যের পাশাপাশি লিঙ্গ বৈষম্যও নারী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। প্রাথমিক স্তরে এখনও এ বৈষম্য বিদ্যমান। বিশেষ করে অনুন্নত গ্রাম ও শহরের বস্তিতে এ চিত্র এখনও দেখা যায়। নিরক্ষর দরিদ্র অনেক অভিভাক ছেলেদের পড়ালেখার ব্যাপারে মনোযোগ দিলেও মেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন। তারা মনে করেন ছেলেরা বড় হয়ে তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং তাদের ভরণ-পোষণ করবে। আর মেয়েরা বিয়ের পরে অন্যের ঘরে চলে যাবে। তাই তাদেও সীমিত অর্থ ছেলেদের পেছনে ব্যয় করলে ভবিষ্যতে কাজে আসবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন গৃহিণীপনাই মেয়েদের মূল কাজ, পড়ালেখার দরকার নাই। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় অনেক মেয়েদের লেখাপড়ার পরিবর্তে ঘরের কাজে ব্যস্ত রাখা হয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিও কারণে অনেক মেয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়; আবার অনেকে ঝরে পড়ে। কিন্তু এ অবস্থা কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

৮. ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতা এবং অর্থায়ন

শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যান্য চ্যালেঞ্জ হলো ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতা এবং অর্থায়ন। প্রাথমিক শিক্ষার খাত এবং উপখাতের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় প্রায় ঘাটতি পাওয়া যায়। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরো সমন্বয় দরকার। শিক্ষার জন্য বর্তমান বরাদ্দ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার বাজেট বরাদ্দের ২০ শতাংশ অর্জনের পথ তৈরি করা যা জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ।

১০. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্থানে বিদ্যালয়ের সময়সূচি:

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ব্যাঘাত ঘটে। প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এ

উল্লেখ আছে, "হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে"।

১১. আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিঃ

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষায় চর্চা করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা দরকার। এই কাজে বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তাছাড়া আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

১২. প্রতিবন্ধী শিশুর শিখন

আমাদের বিদ্যারয়গুলোতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি আজ যুগের দাবি। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এ উল্লেখ আছে, "সব ধরণের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী বান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন– শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে"।

১৩. পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিঃ

আমাদের দেশে অনেক পথশিশু ও অবাঞ্ছিত শিশু রয়েছে। তাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি সাংবিধানিক দায়িত্ব। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এ এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থ গ্রহণ করা এবং বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার বাজেট বরাদ্দের কত শতাংশ অর্জনের পথ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারিত হয়?

ক. ২০ শতাংশ
খ. ৩০ শতাংশ
গ. ৪০ শতাংশ
ঘ. ৫০ শতাংশ

২. রাঙ্গামাটি জেলায় চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে কত শতাংশ পরিবার?

ক. ৩৬%
খ. ৪৬%
গ. ৬২%
ঘ. ৭২%

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইস্যু ও চ্যালেঞ্জগুলোর বিবরণ দিন।
২. বিরাজমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।